ইমাম মাহমুদ এর কাফেলা

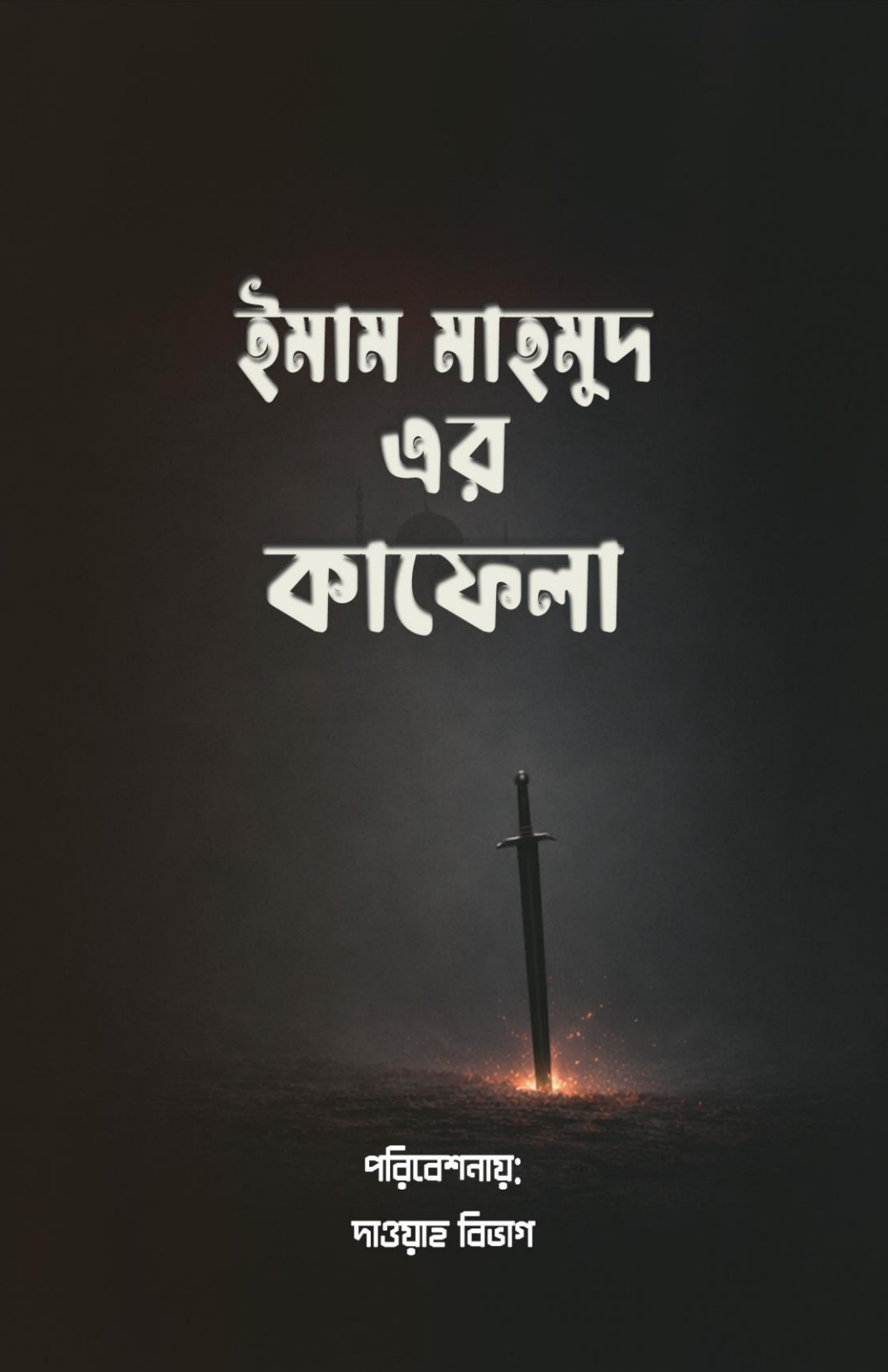

পরিবেশনায়:

দাওয়াহ বিভাগ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইমাম মাহমুদ এর কাফেলা

ভূমিকা

নাহমাদুহূ ওয়ানুছল্লি ‘আলা রসূলিহিল কারীম, আম্মা বা’দ। ইমাম মাহমুদ ও তাঁর দল সম্পর্কে যে বিষয়গুলো জানা দরকার এবং এই দাওয়াহ কি কারণে এবং কেন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি এগুলো স্পষ্ট করা, স্বচ্ছ হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আর্টিকেল[১] টি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ‘আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এর দিকে দাওয়াহ’। সাথে একজন মুসলিমের একটি দল তথা জামায়াত সম্পর্কে, সেই জামায়াতের নেতা ও চেইন অফ কমান্ড সম্পর্কে যা জানা দরকার তা জানানো। যাতে একজন মুসলিম-মুসলিমাহ এমনকি কোন অমুসলিমও অসংখ্য দ্বীন ও ফিরকা থেকে বেছে এই জামায়াতের সাথে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায় যে- “আমি যে জামায়াতে রয়েছি সেই জামায়াতের সাথে অন্য সকল জামায়াতের পার্থক্যগুলো এবং আমি যে জামায়াতে বা দলে রয়েছি সেই জামায়াত তথা দলের সাথে কুরআন এবং রসূল ﷺ এর সুন্নাহ তথা হাদিস এর মধ্যে কতটুকু মিল রয়েছে। আর আমি যে জামায়াতে রয়েছি তা কতটুকু হকের উপর রয়েছে”। অতঃপর আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাতে আল্লাহ সঠিক ও সত্য তথ্য তুলে ধরার তৌফিক দান করেন, আমিন। অতঃপর আমরা আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আগে যেভাবে বলেছিলাম সেই দাওয়াহ এর কথাটি দিয়েই লেখা শুরু করছি।

“ বিশুদ্ধ তাওহীদ ও দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাওয়া এই কাফেলাতে যুক্ত হয়ে দ্বীন কায়েমের একজন সাহসী সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলুন। রসুল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর আনুগত্যে হিন্দের জিহাদে শরিক হয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মাল ও জান ব্যয় করুন।”

১। আর্টিকেলঃ আর্টিকেল (Article) হলো এমন একটি লেখনী যা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়াবলীর উপর তথ্য, বিশ্লেষণ বা মতামত প্রকাশ করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রথমেই জানা উচিত- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দুইটি আলাদা বিষয়। প্রত্যেক মুসলিমের উদ্দেশ্য সব সময় একটিই থাকবে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কার হাছিল করা তথা জান্নাতে দাখিল হওয়া। এজন্য প্রতিটি কাজ ও কথা আল্লাহর জন্যই হওয়া চাই। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে-

বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)। (সূরা আন'আম, আঃ ১৬২)

আর প্রতিটি মুসলিমের জীবনে যতগুলো লক্ষ্য থাকে তার মধ্যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- যদি দ্বীন ইসলাম কায়েম না থাকে, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত না থাকে, ইসলামী ইমারাহ না থাকে তাহলে তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জান ও মাল ব্যয় করা। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমরা ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না। (সূরা আশ-শূরা ৪২:১৩)

দ্বীন ইসলাম কায়েম/প্রতিষ্ঠা একটি ফরজ কাজ, এটি মানতে আশা করি কোন মুসলিমের প্রশ্ন থাকার কথা নয়। যদিও এরকম প্রশ্ন আসে তাহলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে দ্বীন ইসলাম কায়েম এর অর্থ- আল্লাহর আইন মানা, ইসলামী বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যার মধ্যে বাতিলদের, জুলুমকারীদের, আল্লাহদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধীদেরকে তাদের সীমায় নিয়ে আসা, মাজলুমদের সাহায্যকারী হওয়া ও সর্বোপরি বিষয় পৃথিবীতে ফিতনা দমন করে শান্তি কায়েম করা। কারণ অন্য কোন ধর্ম, মতবাদ, আইন দ্বারা তৈরি রাষ্ট্র-সমাজ কখনোই শান্তি কায়েম করতে পারে নি, পারবেও না; শুধু জুলুমই বৃদ্ধি হয় তাতে। আর যদি কেউ এটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস না করে থাকে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। অতঃপর সবচেয়ে বড় কথা এটি (দ্বীন প্রতিষ্ঠা) আল্লাহর হুকুম/আদেশ।

জামাআত

যখন জানা গেল দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে হবে, যা আল্লাহ আমাদের উপর ফরজ করেছেন। কিন্তু তা নিজে একা একা কি কায়েম করা সম্ভব? রাষ্ট্র, ইমারাত, খিলাফত কি একা এক ব্যক্তি দিয়ে হয়? যদিও উক্তি রয়েছে হকের পথে তুমি একা থাকলেও, তুমি একাই একটি জামায়াত। এই উক্তিও সঠিক তবে-

প্রকৃতভাবে দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে হলে একাধিক লোকের জামাআত বা দলবদ্ধ/একত্রিত হওয়াই সর্বপ্রথম কাজ। আজ আমরা যত দল দেখি যাদের বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে তারা কেউই একা নয়, বরং একাধিক লোকের দল যারা কোন একটি মতবাদের উপর দলবদ্ধ হয়েছে।

তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না।
(সূরা আশ-শূরা ৪২:১৩)

উপরের উল্লেখিত আয়াতে ‘‘তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না’’ এ কথা দিয়েই এখানে একের অধিক (তোমরা) তথা জামাআত এর কথা ফুটিয়ে তুলেছে। আল্লাহর আদেশ ও হুকুমও রয়েছে যে তোমরা মুসলিমরা জামায়াতবদ্ধ / একতাবদ্ধ থাকো। আর রসূল ﷺ এর অসংখ্য হাদিসও রয়েছে মুসলিমদের জামায়াতবদ্ধ থাকার বিষয়ে।

এখানে জামা‘আত গঠনের মূল লক্ষ্য হল দ্বীনে হক (ইসলাম) এর প্রচার-প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য (ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য) সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালানো ও মূল উদ্দেশ্য হাছিল করা তথা এর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

আর হাদিসেও মুসলিমদের সব সময় জামায়াতবদ্ধ থাকার কথা বলা হয়েছে-

‘‘হারিছ আল-আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। (১) জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) (প্রয়োজনে) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি

জামা‘আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, তার গর্দান হতে ইসলামের গন্ডী ছিন্ন হয়ে গেল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহবান করল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছলাত আদায় করে ও ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম।’’ (আহমাদ ১৭২০৯; তিরমিযী ২৮৬৩; মিশকাত ৩৬৯৪, সনদ ছহীহ)

- উপরোক্ত হাদীছে মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা‘আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দান করা হয়েছে। নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ একদল মানুষকে একটি জামা‘আত বলে (الجماعة ما اجتمع من الناس على هدف فتحة إمارة) ইসলামের প্রচার-প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত জামা‘আত গঠিত হলে তাকে ইসলামী জামা‘আত বলা হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী আদর্শের প্রচার-প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি যদি লক্ষ্য হয় এবং তা যদি মুসলমানদের দ্বারাও গঠিত হয়, তবে তাকে জাহেলিয়াতের জামা’আত বলা হয়। এইসব জামাআতে যোগদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হলেও তাকে অত্র হাদীছে ‘জাহান্নামীদের দলভুক্ত’ বলে গণ্য করা হয়েছে।

‘‘তোমরা জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরো, আর বিভক্তি থেকে দূরে থাকো।’’ (সুনান তিরমিজি: হাদিস ২১৬৫)

‘‘যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে জামা‘আত ত্যাগ করে মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে।’’ (সহিহ মুসলিম: হাদিস ১৮৪৯)

‘‘শয়তান একা ব্যক্তির সাথে থাকে, আর দু’জন হলে দূরে থাকে। যে জান্নাতের মাঝখানে থাকতে চায়, সে যেন জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরে।’’ (সুনান তিরমিজি: হাদিস ২১৬৫)

এরপরও আমি যুক্তি দিয়ে জামায়াতবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছি যে- জামায়াতবদ্ধ না হওয়া ছাড়া দ্বীন ইসলাম কায়েম সম্ভব নয়, তাই আমাদের জামায়াতবদ্ধ হতে হবে। কিছু কথা প্রচলিত আছে যে- ‘একতাই বল’, ‘দশের লাঠি একের বোঝা’। এসব উক্তি দিয়েও বোঝা যায় একতা/দলবদ্ধতা কতটা গুরুত্ব বহন করে। আর আমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান ও তার বিশাল বাহিনীও ওঁত পেতে থাকে সেই ব্যক্তির জন্য যে

জামায়াতকে ত্যাগ করে একা থাকে। [যেহেতু আমরা আলোচনা করছি দ্বীন ইসলাম কায়েমের বিষয়ে, অর্থাৎ যখন দ্বীন ইসলাম কায়েম নেই তখন কি করতে হবে, তাই আলোচনার মোর সব সময় সেদিকেই রাখছি।]

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতবদ্ধ হওয়ার কথা চিন্তা করলে তখন দুইটি বিষয় মাথায় আসে।

১। আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত কোন জামায়াতে যোগ দিব, নাকি ২। নিজে কোন জামায়াত তৈরি করবো।

যেহেতু ২ নং বিষয় অর্থাৎ নিজে জামায়াত তৈরি করবো দ্বীন ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্য নিয়ে এই খেয়াল তখনই আসা উচিত যখন আমি সকল জামায়াত তথা দল ও আমীরকে যাচাই করেছি (যা আমার তৈরির আগেই তৈরি হয়ে আছে), ভালো করে তাহকীক করেছি, এবং সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়েছি যে ওই সকল জামায়াতগুলো দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়। কিংবা লক্ষ্য ঠিক থাকলেও মানহাজ তথা পদ্ধতি সঠিক নয় কিংবা সেগুলো ঠিক থাকলেও আকীদা-তাওহীদে সমস্যা রয়েছে। কারণ যদি হক জামায়াত থেকেই থাকে আর আমি তাতে যুক্ত না হয়ে যদি নিজের মত চলি তাহলে তা হবে ইসলাম থেকে ছিটকে পড়া, ইসলামী জামায়াত থেকে ছিটকে পড়া, আর নতুন ফিতনা ও ফিরকার আবির্ভাব করা, হকের বিরুদ্ধাচারণ করা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘‘যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামায়াত থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে ইসলামের বন্ধনই তার কাধ থেকে সরিয়ে দিল’। [আবু দাউদ: ৪৭৬০] রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ‘জামা‘আতের উপর আল্লাহর হাত থাকে’। (নাসাঈ ৪০২০; তিরমিযী ২১৬৬; মিশকাত ১৭৩)

তাই আমাদের প্রথমে ১ নং বিষয়টিকে মাথায় রেখে শুরু করতে হবে জামায়াতকে যাচাই বাছাই। কারণ আমার ও আপনার লক্ষ্য কি? নেতা হওয়া? নিজের অনুসারী তৈরি করা? না; লক্ষ্য- এমন জামায়াত যা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে, সর্বদা দ্বীনে হকের উপর অটল থাকবে। আর তাহলে যারা (প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে) বলে- ‘দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা

আমাদের লক্ষ্য না', আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন যে দলের লক্ষ্য না, খিলাফত প্রতিষ্ঠা যাদের পছন্দ না, তাহলে সেই দলে কি যোগ দেওয়ার প্রশ্ন আসে? কক্ষনোই না। যেমন- আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, বাম পার্টি ইত্যাদি? এই সকল দলের ঘোষণাকৃত উদ্দেশ্যতেই তারা বলে যে- ''আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলাম কায়েম না, আল্লাহর আইন তথা শরিয়া আইনে আমরা বিশ্বাস করি না''। তাহলে সেই সকল দলে কি যোগ দেওয়া যাবে? কোনভাবেই না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর পরিবর্তে তাদের নিজেদের বানানো ইসলাম বিরোধী আইন দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ চালানো। যা শয়তান ও তাগুতের কাজ। আর আপনি কি তাগুতের অনুসরণ করে কাফির-মুশরিক হতে চান? তাগুতের জামায়াতে যুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে চান? অবশ্যই না। তাই এরকম দলগুলো জামায়াত বাছাই লিস্ট তৈরির আগেই বাতিল।

অনেকে জামাআতকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। জামাআতে আম্মাহ ও জামাআতে খাছছাহ।

প্রথমটি হ'ল ব্যাপক ভিত্তিক দল বা আধুনিক পরিভাষায় রাষ্ট্রীয় দল বা জামা'য়াত। এই জামা'আতের আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান ইসলামী বিধান মতে রাষ্ট্র শাসন করবেন কিংবা রাষ্ট্র/খিলাফত না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেই হুকুমাতের খলীফার/আমীরের বিরূদ্ধাচরণ করে পৃথক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হত্যাযোগ্য অপরাধ। যেমন বলা হয়েছে, إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا -'যখন দুই খলীফার জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হবে, তখন শেষের জনকে কতল করে ফেল'। (মুসলিম ১৮৫৩; মিশকাত ৩৬৭৬, 'ইমারত' অধ্যায়)

অন্যত্র বলা হয়েছে, مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ -'যখন তোমাদের শাসনভার একজনের উপরে ন্যস্ত থাকবে, এমতাবস্থায় যদি কেউ তোমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায় বা তোমাদের জামা'আতকে বিভক্ত করতে চায়, তাহলে তাকে কতল করে দাও' (মুসলিম ১৮৫২; মিশকাত ৩৬৭৮)। এই 'আমীর' যদি

বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারী হয়, তবে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য 'দীর্ঘ ঝান্ডা' উড়ানো হবে ও তার জন্য জান্নাত হারাম করা হবে। (মুসলিম ১৭৩৮; মিশকাত ৩৭২৭; বুখারী ৭১৫১; মুসলিম ১৪২; মিশকাত ৩৬৮৬)

(তবে ইতিহাসে পৃথক পৃথক অঞ্চলে আলাদা আলাদা ইসলামী সালতানাত (সাম্রাজ্য) একই সময়ে চলেছে, কিন্তু একই অঞ্চলে নয়।)

আমরা এখানে মূলত প্রথমটি নিয়েই আলোচনা করছি। অর্থাৎ, সেই জামাআত গঠন বা যোগদান বিষয়ে যাতে মুসলিম উম্মাহের ব্যাপক স্বার্থ জড়িত এবং এমন জামাআত যা বৃহৎ পরিসরে রাষ্ট্র তথা ইমারত বা খিলাফত গঠন করার লক্ষ্য রাখে।

আর দ্বিতীয় প্রকারটি হল যা মুসলিম উম্মাহের ছোট স্বার্থ নিয়ে গঠিত, যার পরিধি ছোট। যার পরিধি সর্বোচ্চ সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। যেমন- দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঈমানদারদের বিশেষ বিশেষ জামা'আত, যদিও প্রথম প্রকার জামাআতটিরও উদ্দেশ্য থাকে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধ। তবে দ্বিতীয় জামাআতটি হচ্ছে সেই হাদিসের উদাহরণ- কোন স্থানে তিন জন মুমিন থাকলেও এক জনকে 'আমীর' নিয়োগ করে এই ধরনের কল্যাণমুখী জামা'আত গঠন করা যাবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

'একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত কোন তিনজন লোকের জন্যও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়'। (আহমাদ ৬৬৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৬৩৬২; ছহীহাহ হা/১৩২২-এর আলোচনা)

আর এই দ্বিতীয় প্রকার জামায়াত ছোট পরিধিতে যেকোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট একক লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হতে পারে কিংবা ভেঙ্গে ফেলা যেতে পারে, মুহূর্তে মুহূর্তে আমীরও পরিবর্তন হতে পারে, তবে বৃহৎ স্বার্থে গঠিত মুসলিমদের জামায়াতটি সর্বদা টিকিয়ে রাখতে হবে, এবং এর কোন নির্দিষ্ট পরিধি নেই। দ্বিতীয় প্রকার জামায়াতটি এমন, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে মূল

সেনাপতির আন্ডারে ছোট ছোট বাহিনী ও সেই ছোট বাহিনীর আবার নেতা নির্ধারণ। আর সেনাপতি (যুদ্ধে মূল নেতা) চাইলে সেই ছোট বাহিনী ভেঙ্গে বৃহৎ করতে পারেন, কিংবা বিলুপ্তও করতে পারেন। তথা প্রথম প্রকার হক জামাআতেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও বলা যায়। আর আমরা সেই মূল জামাআতেরই আলোচনা করছি যার আকিদা-মানহায হবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর এবং লক্ষ্য হবে সারা জাহানে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা।

দলাদলি নিষিদ্ধ যখন

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বীনের দাওয়াত, জিহাদ ও খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে হোক কিংবা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যেও হোক দলাদলি ও পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, وَلاَتَجَسَّسُوا، وَلاَتَحَاسَدُوا، وَلاَتَدَابَرُوا، وَلاَتَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَاللهِ إِخْوَانًا- 'তোমরা পরস্পরে ছিদ্রান্বেষণ করোনা, হিংসা করো না, বিদ্বেষ করোনা, চক্রান্ত করোনা। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও'। (বুখারী ৬০৬৪; মুসলিম ২৫৬৩; মিশকাত ৫০২৮)

অনেকেই বলে থাকে দলাদলি নিষিদ্ধ এবং এর সাথে আরো কিছু হাদিসের দলিল দেখিয়ে বলে সকল দল-মত তথা জামায়াত ত্যাগ করে আলাদা থাকাই শ্রেয়। মূলত দলাদলি ও জামায়াত দুইটা ভিন্ন জিনিস। তাই অসংখ্য জামায়াত দেখে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত না। হাদিসে এসেছে-

আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বনু ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল আমার উম্মতরাও ঠিক তাদেরই অবস্থায় পতিত হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনূ ইসরাঈলরা তো ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এদের ১ টি দল ছাড়া সব (৭২) দলই হবে জাহান্নামী। সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এরা কোন দল? তিনি বললেনঃ আমি এবং আমার সাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত। (হাসান, মিশকাত, তাহকিক ছানী ১৭১; সহিহাহ ১৩৪৮; তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ আল মাদানী প্রকাশনী ১৬৪১, ইসলামিক ফাঃ ২৬৪২)

তারা বিভিন্ন দল-মত দেখে সবগুলোকেই ফিতনা/ফিরকা হিসেবে নিয়েছে আর ফিতনা থেকে দূরে থাকাই নাকি তাদের উদ্দেশ্য। কথা ভালো শুনালেও এর উদ্দেশ্য খারাপ। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জামাআতে যুক্ত হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কঠিন কাজ ও ব্যক্তি জীবনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কিংবা ভয়-কাপুরুষতার কারণে একা একা ইসলাম পালন করতে চাওয়া অথবা জ্ঞানস্বল্পতার কারণে ভুল ব্যাখ্যা বুঝে সঠিক জামাআত থেকে দূরে থাকা, বা জামায়াতবদ্ধ থাকতে না চাওয়া। যারা বলে থাকে সব জামাআতই ফিরকা বা দলাদলি, তারা ঐ হাদিসকে অস্বীকার করে যাতে বলা আছে যে- একটি জামাআত সর্বদা হকের উপর থাকবে। আর জামাআত ততদিন হবে যতদিন জিহাদ চলবে। আর জিহাদ কোন সময় পর্যন্ত চলবে এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে-

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হক-এর উপর লড়াই করবে। তারা শত্রুপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে"। (আবু দাউদ ২৪৮৪, মিশকাত ৩৮১৯)

অতএব যারা নীচের হাদিস ব্যাখ্যা দেয়-

উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (রহঃ) .... মুসলিম (রহঃ) তার পিতা আবূ বকর (রা:) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি ফিতনা প্রকাশ পাবে, যখন শায়িত ব্যক্তি উপবেশনকারীর চাইতে, উপবেশনকারী দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি পথচারীর চাইতে উত্তম হবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সে সময়ে আমাদের কি করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ সে সময় যার কাছে উট থাকবে, সে যেন তার উটের সাথে গিয়ে মিশে; যার কাছে বকরী থাকবে, সে যেন তার বকরীর সাথে গিয়ে মিশে এবং যার কোন ক্ষেত থাকবে, সে যেন সেদিকে মনোসংযোগ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। তিনি বলেনঃ যার এ সবের কিছুই থাকবে না, তার উচিত হবে, তার তরবারির ধার পাথরের উপর আঘাত করে নষ্ট করে ফেলা এবং যথাসম্ভব সে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা। *

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৫৬ [ইঃ ফাঃ ৪২০৭]; মুসলিম; আহমাদ)

- * অনেকে এই হাদিস ব্যবহার করে বলে যে, এখন ফিতনার সময়; এখন আমাদের যুদ্ধ থেকে এড়িয়ে থাকতে হবে। তরবারি ভেঙ্গে ফেলতে বলেছে, পালাতে বলেছে। কিন্তু তারা এই হাদিসের প্রেক্ষাপটগুলো দেখে নাই। এর আগে পরের হাদিসগুলোও দেখে নাই। এটি হচ্ছে সেই সময় যখন আর কোন আমীর, খলীফা বা

শাসক আসবেন না। এবং হাদিসে সরাসরি বলা হয়েছে মুসলিমদের সর্বশেষ যুদ্ধ দাজ্জাল ও তার বাহিনীদের সাথে। এরপর আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই, কিন্তু এর আগে তো বন্ধ হওয়ার কথা বলা নেই। উপরে সেই হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা (আঃ) এর যুগ ও তার মৃত্যুর পরের যুগ যদি কেউ পায় তাহলে তার কাজ হবে সেটি যা এই হাদিসে বলা হয়েছে। এক কথায় দাজ্জাল ও দাজ্জালের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করা যাবে না। সেটি শেষ হলে হাদিসে যেরকম বলেছে সেরকম করতে হবে। এরপর আর কোন জিহাদ নেই আর ঈসা আঃ এর মৃত্যুর পর আর কখনো দ্বীনও কায়েম হবে না। এটিই এই সকল হাদিসের ব্যাখ্যা। তাই যারা বর্তমান ফিতনার কথা বলে এই হাদিস খাটিয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করতে চায় তাদের উচিৎ জিহাদ বন্ধ কবে হবে সেই হাদিস পড়া। যেহেতু আমরা জানতে পেরেছি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ নেই, জিহাদ নেই, তাই সে পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করা যাবে না; আর দাজ্জালের আবির্ভাব এখনো হয়নি তাই জিহাদ চলতে থাকবে। তাই বর্তমানে যারা জিহাদ-কিতালের পথে রয়েছে তারাই সঠিক কাজ করছে এবং এই সকল ফিতনার হাদিসের সঠিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে।

তবে এটিও এই হাদিসের ব্যাখ্যা হয় যে- যদি কোন জামায়াত না থাকে যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আকীদা-মানহাজ দ্বীনের হকের উপর নেই তাহলে সেই সময়ও একা থাকা জরুরী। সেই সকল দল-মত তথা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদেরই বড় কোন জামাআত হোক না কেন তা বাদ দিয়ে হক দলের সন্ধান করা কিংবা নিজে হকের প্রচার-প্রসার করে জামাআত গঠন করে জিহাদ করাও উত্তম হবে। এছাড়া যদি তখন কোন আল্লাহ প্রদত্ত আমীরের আগমন হয় তখন তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর আদেশে জামাআতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব। কিন্তু হক দল থাকা অবস্থায় তাতে যুক্ত না হলে এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হতে হবে।

জামাআত বাছাই

জামাআত বাছাই পর্বে আমরা দেখবো কারা একই লক্ষ্য নিয়ে ছুটে যাচ্ছে তথা দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য জামাআতবদ্ধ হয়েছে। অথবা অন্তত বলে যে- ‘‘আমরা দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে চাই, আমরা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চাই’’। এরকম লক্ষ্য রয়েছে যেসকল দলের তার মধ্যে কিছু দলের নাম- জামায়াতে ইসলামী, খিলাফতে মজলিস, ইসলামী

আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই), আহলে হাদিস ও এরকম যারা আরো রয়েছে। অতঃপর, আল কায়েদা (ও অঙ্গ শাখা), তালিবান, ইমাম মাহমুদ এর কাফেলা, আইএস (ইসলামিক স্টেট), আনসার আল ইসলাম/আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, জেএমবি, হুজি (হারকাতুল জিহাদ আল ইসলামি), হিজবুত তাহরীর (HT), হিজবুত তাওহীদ, আল্লাহর দল ইত্যাদি।

(একটি বিষয় অনেকের প্রশ্ন থাকে কিংবা যুক্তি দেয় যে, আমরা মুসলিম। আমাদের এত দল কেন আর এরকম দলের নাম দেওয়াও তো জায়েজ নেই। কথাটি অনেকটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও এটা বুঝে নেওয়া দরকার যে যখন কোন মতাদর্শ তৈরি হয় কারো মাধ্যমে আর সেই আদর্শের বহু অনুসারী হয় তখন সেটিই একটি দল হয়ে যায়। নাম দেওয়ার সব সময় দরকার পরে না। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি- রসূল ﷺ এর জামানায় মুশরিকরা রসূল ﷺ এবং তার অনুসারীদের অনেক সময় এভাবেও ডেকেছে যে, মুহাম্মদের দলের লোকেরা এটা করেছে, ওটা করেছে। দেখুন, কিভাবে নেতার নামে সেই মতের উপর, আদর্শের উপর তথা মুসলিমদের উপর এরকম পরিচয় ও চেনানোর জন্য নাম তৈরি করেছে। একইভাবে হযরত আলী রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ যখন দুজন যুদ্ধে নামে তখনও তাদের অনুসারীদের নিয়ে কোন দলের নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু ঠিকই পার্থক্য করার জন্য আলীর দলের লোকেরা কিংবা আলীর দল আবার মুয়াবিয়ার দলের লোকেরা কিংবা মুয়াবিয়ার দল এভাবে বলে আলাদা করে দিচ্ছে, করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা বাঁধে আরো পরবর্তীতে যখন বিভিন্ন ফিরকার-বিদআতীর আবির্ভাব হয় আর তারাও তখন নিজেদেরকে মুসলিমই দাবী করা শুরু করে। তারাও মুসলিম আবার আমরাও মুসলিম, তখন এই পার্থক্য করার জন্য বিভিন্ন ফিরকার নামকরণ হয়। জাহমিয়া, মুরজিয়া, খারেজি, সাবায়ী, শিয়া ইত্যাদি। এরপর সঠিক ইসলাম এর সেই মুসলিম পরিচয়কে ধরে রাখা হয় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ নামে। অর্থাৎ যারা সঠিকভাবে রসূল ﷺ এর সুন্নাহকে পালন করে, তাঁর পথের উপর রয়েছে এমন জামায়াত। কিন্তু দেখা যায় যুগে যুগে ইসলাম আর মুসলিম টাইটেল থেকে গেলেও তাদের কর্মপন্থা ইসলামের সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, বিভিন্ন ফিরকা তৈরি হতেই থাকে, কিন্তু সবার আবার পরিচয় মুসলিমই; বলা যায় নাম একই কিন্তু ফরমালিন ও ভেজালযুক্ত। তার মধ্যে যেমন একটি উদাহরণ জিহাদ বিষয়ে তথা দ্বীন ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা। তখন ইসলামের সঠিক বুঝ পাওয়া লোকদের নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হয়েছে, কখনো নেতার নামে কিংবা একটি দলের নামকরণের মাধ্যমে দলকে আলাদা করা গেছে। যেমন- শিয়া গোষ্ঠী, মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ভন্ড নবী দাবীদারের অনুসারীদের কাদিয়ানী নামকরণ। এরাও

নিজেদের মুসলিম দাবি করে কিন্তু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর মতে এরা পথভ্রষ্ট। এরপর যেমন আবুল আলা মউদুদি (রহঃ) তিনি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন জামায়াতে ইসলামী। উদ্দেশ্য ছিল সকল লোকই যখন মুসলিম মুসলিম বলে কিন্তু ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়গুলো বুঝে না, 'ইসলাম শুধু ব্যক্তিজীবনে পালন করলেই হয়' -এরকম ভুল মতবাদ থেকে সঠিক ইসলামকে নিয়ে আসার জন্য, সেই সঠিক মতবাদের লোকদের একত্র করার জন্য তৈরি করেন 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল। তিনি বলেন- রাজনীতি আলাদা জিনিস নয়; ইসলাম নিজেই রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা উভয়কেই ধারণ করে; তাই ''ধর্ম'' ও ''রাজনীতি'' আলাদা করে ভাবা উচিত নয়। আর এই সঠিক মতবাদের উপর লোকদের নিয়ে আসার জন্যই এরকম দলের নামকরণ, অর্থাৎ এমন মুসলিমদের জামায়াত যারা দ্বীন কায়েম করতে হবে বুঝে, রাজনীতি আর ইসলাম আলাদা নয় অভিন্ন জিনিস এটি বিশ্বাস করে ও সে অনুযায়ী কাজ করবে; তাদের মিলে একটি জামায়াত। কিন্তু যদি নামকরণ না করতেন তাহলে সকলেই মুসলিম আর মুসলিম। এদের মধ্যে এই আদর্শগত পার্থক্য করা যেত না বা খুবই কঠিন হতো। হয়তো তখন মউদুদির (রহঃ) দল বা অনুসারী হিসেবে পরিচয় পেত। যেমন বর্তমানে তাওহীদবাদীদেরকে বলা হয় উগ্রবাদী বা মৌলবাদী। যদিও এই নাম দিয়েছে বিধর্মী-নাস্তিক ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে চরম মূর্খরাই, কিন্তু তারা এমন কিছু আদর্শ দেখে এদের আলাদা করেছে যেই আদর্শই হচ্ছে সঠিক ইসলামী আদর্শ। আর বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী নামে যে দলগুলো চলতেছে বাংলাদেশে, ভারতে কিংবা অন্য রাষ্ট্রে সেগুলোর সাথে সেই মউদুদি (রহঃ) এর জামায়াতে ইসলামীর অনেক তফাৎ। মত ও পথ অনেক ভিন্ন হয়ে গেছে বিবর্তনে; যেমন- মউদুদি (রহঃ) গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন, একে বাতিল বলেছেন, কিন্তু বর্তমানের জামায়াতে ইসলামী এটিকে জায়েজ বলছে ও তাতে সহমত পোষণ করছে। যা দিয়ে দলের নাম একই হলেও নীতিগত পরিবর্তন হয়েছে (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে)। তাই পরিচয় আলাদা করার জন্য দলের নাম দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এরকমও দেখা যায় যে শুধুমাত্র কেউ নেতা সাজার জন্য একটা দল ও দলের নাম প্রতিষ্ঠিত করে বসে আছে, উদ্দেশ্য অনুসারী তৈরি ও ক্ষমতা পাওয়া। যা একটা ফিরকা ছাড়া কিছুই না। তাদের তেমন কোন আদর্শিক পার্থক্য তাতে থাকে না। বিষয়টি ঐচ্ছিক হয়ে যায়। কিন্তু দল হতে হবে সব সময় এমন যে সেই দলের মতাদর্শ ঐচ্ছিক হওয়া যাবে না। অবশ্যই পালনীয় মতাদর্শ হওয়া উচিত, এভাবেই বাতিল থেকে হক দল আলাদা হয়ে থাকে। আশা করি এ আলোচনায় দলের নামকরণ বিষয়টি মানুষ মধ্যমপন্থায় দেখবে। যদিও ইমারত ও খিলাফত হলে, রাষ্ট্রীয় একটি ভিত্তি হলে তখন খলীফা ও খিলাফতের প্রতি আনুগত্যতার বিষয় বাকি থাকে, সেই মুসলিম জামায়াতের আলাদা কোন নাম আর থাকে না, থাকার কথা না। তাই দলের কোন নাম হয়ে থাকলে নামটি একমাত্রই সাময়িক সময়ের জন্য হয়ে থাকে। যেমন ইমাম মাহদীর

দল। কিন্তু যখন খিলাফত আসবে তখন খলীফা মাহদীর কাছে বায়াত নেওয়া মুসলিম জামায়াত আর এরকম নাম ব্যবহার করবে না।)

অতঃপর, এখন এ সকল দলের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো আমাদের করতে হবে তা হচ্ছে এইসকল দলের আকিদা, মাজহাব, মানহায এবং সর্বোপরি কুরআন-সুন্নাহ মতানুযায়ী কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দলের নেতা।

দলের তথা জামায়াতের নেতা কেন গুরুত্বপূর্ণ

একটি দলের নেতাই হচ্ছে দলের মূল। কারণ একটি দল বা জামাআত এর মতবাদ, এবং সেই জামাআতটি হওয়ার যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তা একজন নির্ণয় করে এবং সেই মতবাদে যারা একমত তারা মিলেই তৈরি হয় জামাআত। আর সেই দল বা জামাআত তৈরির আহবানকারীই বেশির ভাগ সময় সেই দলের নেতা হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন-

সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে (দল/জামাআতকে) তাদের নেতাসহ (ইমামসহ) ডেকে নেব। (সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাঈল) ১৭:৭১)

দলের/জামায়াতের নেতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ কারণে যে-

১। জামায়াতের দিক, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেতার মতানুযায়ী চলে। তাই নেতার আকিদা, মানহায-মাযহাব, আদর্শ দেখলেই দলের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো ধারণা পাওয়া যায়।

২। দলের নেতা একাধিক হলে সেই দলটি সিদ্ধান্তহীনতায় থাকবে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে না, দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে। তাই অবশ্যই দলের মূল নেতা একজনই থাকতে হবে। যদি এরকম দেখা যায় যে দলের নেতা কে তা নিয়ে বিভ্রান্তি, কিংবা শুরা নামের কোন পরিষদের কয়েকজন মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেয় আর সেটা চুড়ান্তভাবে ফায়সালা দেওয়ার মত নেতা নির্বাচিত না থাকে, তাহলে সেখান থেকে দ্রুতই কেটে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে সেই জামায়াত কখনো সফল হতে পারবে না। তাদের মধ্যে ক্রন্দল, বিদ্রোহ, বিভক্তি, দলাদলি লেগেই থাকবে।

৩। নেতা যেদিকে ফিরবে, দলও সেই দিকে মোড় নিয়ে থাকে, তাই দলের কার্যক্রম দেখেও নেতার অবস্থা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি বোঝা যায়। আর যদি এরকম হয় যে নেতার আদেশ মত দলের/জামায়াতের লোকেরা চলছে না, তাতে নেতা হকের উপরে থাকলে তার কোন দোষ নেই। কিন্তু নেতা বাতিলের উপর চললে অনুসারীরা বিরোধ করলে, তখন সেটাই করা উচিত। তবে তখন অবশ্যই শক্ত-মজবুত দলিল থাকা লাগবে নেতা বাতিল হওয়ার, আর তা হচ্ছে কুফর-শিরক। এজন্যও দলের নেতার বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

৩। কোন দলের নেতা যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তৈরি করে যায়, তার স্থলাভিষিক্ত নেতার একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নিয়ত নাও থাকতে পারে এবং তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে একটি দল হক থেকে বিচ্যুত হয়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে, আবার একই ভাবে পুনরায় নেতা পরিবর্তনের ফলে সেই বাতিল দলটি হকের উপর চলে আসতে পারে। তাই নেতাকে ও নেতার জামায়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মানহায জানা খুবই জরুরী, কারণ তা দিয়েই দলটি হকের উপর না বাতিলের উপর অবস্থান করছে তা জানা যায়।

যদি এরকম কোন জামায়াত দেখা যায়- যারা কোন এক মতবাদের উপর এক আছে, যেমন দ্বীন ইসলাম কায়েম করাই উদ্দেশ্য, কিন্তু কোন জামায়াতবদ্ধ হওয়ার বিষয় নেই, কোন পরিকল্পনা-প্রস্তুতি নেই, বিচ্ছিন্ন; তাহলে সেটি কোন দল নয়। শুধুই মতবাদ যার উপর অনেকে সহমত পোষণ করে থাকে। তারা সকলে একত্র হলে সকলে সকলের সেই মতবাদের উপর সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু কোন দলীয় উদ্যোগ নেয় না কিংবা তাদের কোন মূল নেতাও নেই যাকে তারা আনুগত্য করে বা তারা নির্ধারণও করতে পারে না যে কে নেতা হওয়ার উপযুক্ত; এরকম হলে সেটি কোন দলই না, সেই মতবাদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের সাথে শুধু শুধু থেকেও কোন লাভ নেই; সেটিকে মুসলিম জামায়াত মনে করা হবে মূর্খতা আর তা দ্বারা দ্বীন ইসলামও কখনোই কায়েম হবে না। কারণ প্রকৃত জামায়াত হয়ই নেতার আনুগত্যের মাধ্যমে। আর নেতা/আমীর ছাড়া জামায়াত চলতে পারে না, দল / জামায়াত হতেই পারে না। হাদিসে এসেছে-

“নিশ্চয়ই ইমাম (নেতা) হলো ঢালস্বরূপ। তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তার মাধ্যমে নিরাপত্তা নেওয়া হয়।” (সহিহ বুখারি: হাদিস ২৯৫৭; সহিহ মুসলিম: হাদিস ১৮৪১)

দল বা জায়ামাতের দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার মানহায বা পদ্ধতি বাছাই

মানহাজ / মিনহাজ (منهاج) শব্দটি আরবি। এর অর্থ-

- স্পষ্ট পথ
- নির্ধারিত পদ্ধতি
- চলার পরিষ্কার রূপরেখা
- জীবনযাপনের পথ ও পন্থা

সূরা আল-মায়েদা ৫:৪৮ এ বলা হয়েছে-

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি একটি শরিয়ত ও একটি মানহাজ/মিনহাজ (পদ্ধতি/পথ)। এখানে-

(১) শরিয়ত = কী করতে হবে তথা আল্লাহ যা আদেশ করেছেন। (আইন, বিধান)

(২) মানহাজ/মিনহাজ = কীভাবে করতে হবে (পদ্ধতি, পথ)

আর এই ‘কিভাবে করতে হবে’ তা শিখিয়েছেন রসূল ﷺ। তাই তার পদ্ধতিকে বলা হয় মিনহাজুন নুবুয়াহ।

মিনহাজুন নুবুয়্যাহ (منهاج النبوة) বলতে বোঝায়-

নবী ﷺ যেভাবে ইসলাম বুঝেছেন, বাস্তবায়ন করেছেন ও সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন -সেই পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও পথ।

সংক্ষেপে:

নবীর (ﷺ) আকিদা + আমল + দাওয়াহ + রাজনীতি/শাসন + আখলাক = মিনহাজুন নুবুয়্যাহ

এখন আমরা যদি, রসূল ﷺ এর কর্মপদ্ধতি থেকে বর্তমান এখন পর্যন্ত সময়ে যেভাবে ইসলাম যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা করেছে আর ইসলামে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা তাদের জীবনী ও কর্মপদ্ধতি দেখি তাহলে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যায় যে- দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতি তা হচ্ছে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এবং সে পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবারই রয়েছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও জান-মাল উৎসর্গ করার ইতিহাস। যেভাবে ইসলামী বিভিন্ন সালতানাত তথা যেকোন ছোট বড় ইসলামী শাসনব্যবস্থা, যেকোনো অঞ্চলভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ইতিহাসও একই।

এখানে সকলের একটি বিষয় স্পষ্ট থাকা উচিত যে- কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর একটি অংশ। জিহাদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হলেও দ্বীন কায়েমের জন্য চূড়ান্তভাবে কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ ই একমাত্র সমাধান, কারণ ইসলামের শত্রুরা আপনাকে কিতালের মাধ্যমেই নির্মূল করতে চাইবে এবং করবেও, তাই আপনাকেও সেই কিতালের পদ্ধতিতেই তাদের মোকাবেলা করতে হবে। আমি সংক্ষেপে কিছু যুক্তি দিলাম যদিও আল্লাহ সরাসরি আদেশ করে দিয়েছেন-

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৩)

দ্বীন অর্থ- ধর্ম, আনুগত্য, শাসনব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা ইত্যাদি। আর ইসলাম ব্যতীত সকল মতবাদই ফিতনা। সেই সকল মতবাদকে তাদের সীমার মধ্যে আনার জন্য, জালিমদেরকে প্রতিহত করার জন্য, সর্বোপরি দ্বীন ইসলাম কায়েমের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করার জন্য একমাত্র পদ্ধতিই হলো কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ যুদ্ধ।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাও: হাবিবুর রহমান বলেন, উক্ত আয়াতের এখানে ফিতনা দ্বারা সেই অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা দ্বীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো উল্লেখিত ফিতনার অবসান হওয়া এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া। আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দে আভিধানিক অর্থ আনুগত্য, আর এর পারিভাষিক অর্থ

সেই জীবনব্যবস্থা যা কাউকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জেনে তার বিধান ও নীতিমালার আওতাধীন থেকে গ্রহণ করা হয়। অতএব সমাজের সেই অবস্থা যাতে মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে, সমাজের এরূপ অবস্থাকেই ফিতনা বলা হয়। আর ইসলামী (সশস্ত্র) জিহাদের লক্ষ্য হলো, সমাজে বিরাজমান উপরে উল্লেখিত ফিতনা নির্মূল করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ নির্বিঘ্নে শুধুমাত্র আল্লাহ বিধানবলিরই আনুগত্য করবে। (শব্দে শব্দে আল কুরআন ১ম খন্ড, পৃ: ২০১, টিকা ২৫২)

গণতন্ত্র এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা তথা দ্বীন ইসলাম কায়েম

বর্তমানে পৃথিবীতে অন্যতম বড় মতবাদ হচ্ছে গণতন্ত্র। বিভিন্ন জামায়াত আছে যারা গণতন্ত্র এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে। এটাকেই জিহাদ বানিয়ে নিয়েছে।

গণতন্ত্র যে একটি কুফুরি মতবাদ এটি নিয়ে বেশির ভাগ আলেমদেরই ইজমা রয়েছে, অসংখ্য আলেমদের যুক্তি ও দলিল প্রমাণ দিয়ে লেখা বই রয়েছে যা পড়লেই যে কেউ স্পষ্ট হতে পারবে কিন্তু যেহেতু বর্তমানে এর মাধ্যমে ইসলামী মতাদর্শের অনেক লোকেরা ও কিছু স্বার্থান্বেষী আলেমরা ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ দেখছে তাই তারা নিজেদের দল ভারি করতে এবং এটিকে হালাল করতে ও দলের লোকদের বুঝ দিতে বলে থাকে এটাই জিহাদ। আর এটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না বলে উল্টা বুঝায়- এটি ইজতিহাদি বিষয়, মাসআলাগত বিষয়। আর তাদের দেওয়া এই হাস্য নাম তথা ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জান্নাতে যাওয়ার আশাও দেওয়া হচ্ছে মুসলিমদের। আবার অনেকে প্রকাশ্যে বলে থাকে গণতন্ত্র হারাম এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসে বলা নেই।

তাদের যদি প্রশ্ন করেন- গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি আগে কোন সময় ইতিহাসে? এখন কোথাও গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আইন আছে কিনা কোথাও? দেখবেন তারা উত্তর দিতে পারবে না।

যেখানে আল্লাহ এবং রসূল ﷺ যে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে যারা সেই একই পদ্ধতি দিয়ে ইসলাম কায়েম করার উদাহরণ দিয়ে গেছেন, সেই পদ্ধতি ব্যবহার না করে গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম কায়েম করতে যাওয়া বড় রকমের কুফুরি কাজ। আল্লাহ এবং রসূল ﷺ যে পদ্ধতির বিষয়ে বলে গেছেন, দেখিয়ে গেছেন সেটিকে উপেক্ষা করা কত বড় মারাত্মক অপরাধ হতে পারে একবার চিন্তা করুন। গণতন্ত্রের ধারক-বাহক, সারা বিশ্বের মাতুব্বর আমেরিকা কি সকল দেশের উপর মাতুব্বরি কি ভোট দিয়ে পেয়েছে? নাকি পারমানবিক বোমা ও অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মাতুব্বরি করে? এই একটি প্রশ্ন মাথায় আনলেই বুঝতে পারবেন যে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ঠিকই বুঝে শক্তি কোন জিনিসে, আর তাদের বানিয়ে দেওয়া একটা ফর্মুলা গণতন্ত্র খাইয়ে খাইয়ে সেই শক্তি দিন দিন নিঃশেষ করার চেষ্টায় আছে এরা। আর একারণেই সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে এরা হামলা, যুদ্ধ, লুটপাট করে বেড়াচ্ছে, কেউ কিছু বলতে পারছে না। যারাই আমেরিকাকে মাতুব্বর হিসেবে মেনে না নেয় তখন তারা শুধু মিছিল-মিটিং আন্দোলন করে না, রাস্তায় প্রতিবাদ জানায় না। সরাসরি যুদ্ধ করতে সৈন্য ও অস্ত্র প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেয়। এগুলোর পরেও যারা বুঝে না গণতন্ত্র কি, কত বড় ধোঁকা, তাহলে তারা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তর তালাবদ্ধ অন্ধ-বধীর লোক, যারা কখনো হেদায়েত পায় না।

অতঃপর যদি দেখতে চান কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা, আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন বা আংশিকও করা গেছে কিনা তাহলে ইতিহাসের দিকে তাকাতে পারেন এবং বর্তমানেও বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে তাকাতে পারেন যেখানে বিভিন্ন জামাআত বড় বড় অঞ্চল দখলে নিয়ে সব না পারলেও কিছু ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রেখেছে। আর তা হয়েছে বা হচ্ছে কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে; যেখানে মাল ও জান ব্যয় হচ্ছে। গণতন্ত্র দিয়ে যেসকল মুসলিম দেশ চলে যেমন- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, তুরস্ক, মিশর, জর্ডান, আলজেরিয়া, আজারবাইজান, লেবানন, লিবিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি দেশ ও যেখানে কিছু দেশে পুরো গণতন্ত্র না থাকলেও আংশিকমাত্র ঢুকেছে

সেখানেও ইসলামী শাসন, ইসলামী আইন প্রয়োগ করার মত অবস্থা নেই, চলছে মানুষের বানানো আইনই কিংবা বিভিন্ন ক্রন্দল। আর সৌদি আরব এখনও রাজতন্ত্রে চলছে, যদি সেটিও গণতন্ত্র দিয়ে চলতো তাহলে সেটিও আজকে পুরোপুরি বাতিল মতাদর্শের উপর চলে যেত, সব সময় ক্রন্দল-হানাহানি লেগেই থাকতো। যদিও সেই রাজতন্ত্রকেও এখন ইহুদি-খ্রিষ্টানরা নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই দিন দিন ইসলামী আইন পরিবর্তন হয়ে গণতান্ত্রিক বাতিল বিভিন্ন শয়তানী আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে সেদেশেও।

এই সকল উদাহরণ দেখেই বিবেকবানদের বুঝতে পারার কথা এবং এই মতবাদ ও এই সকল পদ্ধতি দিয়ে দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে চাওয়া জামায়াতগুলোকে 'মানহাজ তথা পদ্ধতি ভুল' সাব্যস্ত করে সঠিক দল বা জামায়াত বাছাই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া। যদি না এরকম হয় যে এটি বাতিল জানার পরেও ইচ্ছে করেই ক্ষমতার লোভে, স্বার্থ হাসিলের জন্য এই মতবাদে জড়িয়ে পরে যেমনটা বর্তমানে ব্যাপকহারে হচ্ছে।

তাই যেহেতু আমরা দলিল-প্রমানে বিশ্বাসী তাই যদি তারা দেখাতে পারে যে গণতন্ত্র দিয়ে বিশ্বে কোথাও ইসলামী আইন চলেতেছে কিংবা ইতিহাসে এরকম হয়েছে যা কমপক্ষে ৫ বছরের মত টিকে ছিল, তাহলে তাদেরকে বাতিল জামায়াতের তালিকা থেকে বাদ দিব এবং আবার পর্যালোচনার জন্য জামায়াত বাছাই তালিকাতে রাখবো। কিন্তু তারা তা দেখাতে পারবে না।

তাহলে গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা তথা দ্বীন কায়েম করতে চাওয়া এই বাতিল মানহাজ এর দল তথা জামায়াতগুলো হলো- জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই), বাংলাদেশ খিলাফত মজলিস, খিলাফতে মজলিস, ইসলামী ঐক্যজোট ও এরকম আরো যত জামায়াত আছে যারা দ্বীন কায়েম করতে চায়(যদিও অনেকের উদ্দেশ্যও একই না) কিন্তু আল্লাহর আদেশ, রসূল ﷺ এর পদ্ধতি ও যুগে যুগে পরিক্ষিত, প্রমাণিত, সফল পদ্ধতি বাদ দিয়ে গণতন্ত্র পদ্ধতিতে, তারা সকলেই বাতিল। এসকল জামায়াতগুলো জামায়াত বাছাইকরণ তালিকা থেকে বাদ হবে।

আর গণতন্ত্র বিষয়ে অনেকের লেখা অনেক বই আছে এবং এ বিষয়ে ফতোয়াও আছে যা থেকে আমি কিছু উল্লেখ করছি ও বইয়ের তালিকা দিচ্ছি-

ইয়েমেনের শাইখ মুক্বিল বিন হাদী আল-ওয়াদিঈ (রহিঃ) বলেন, "গণতন্ত্র মহামহিম আল্লাহর প্রতি প্রকাশ্য কুফর। যে ব্যক্তি এর প্রতি আহ্বান জানায় অথবা এটাকে সমর্থন কিংবা ডিফেন্ড করে-সে কাফের; যদিও সে ছলাত আদায় করে, সওম রাখে এবং নিজেকে মু'মিন দাবি করে"। [ক্বাম 'উল-মু'আনিদ ওয়া যাজরুল হাক্বীদিল-হাসিদ: ২২]

আল্লামা ইবনু বায (রহিঃ) (সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি) বলেন, "যে ব্যক্তি সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম বা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক মতাদর্শের প্রতি আহ্বান জানায় যা ইসলামী শরীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক, তবে সে একজন পথভ্রষ্ট কাফির, যে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের চাইতেও বড় কাফির। এছাড়া যে ব্যক্তি তাদের গোমরাহীতে সাহায্য করে, তারা যে বিষয়ে আহ্বান করে তার প্রশংসা করে এবং ইসলামের দাওয়াহ প্রদানকারীদের অপবাদ দেয়, তাদের মানহানি করে, সেও একজন পথভ্রষ্ট কাফির যার বিধান হচ্ছে নাস্তিকদের বিধানের মতো"। [মাজমুউ-ফাতাওয়া ইবনু বায : ১/২৬৯]

গণতন্ত্র নিয়ে লেখা কিছু বই যা পড়ে হয়তো কারো বিবেক খুলবে-

১। গণতন্ত্র একটি দ্বীন, শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসী
২। ইসলাম ও গণতন্ত্র, মাওলানা আসেম ওমর
৩। ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
৪। ইসলাম ও গণতন্ত্র একটি পর্যালোচনা, মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান (পাকিস্তান)
৫। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ, হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
৬। তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ, হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

অতঃপর সঠিক মানহাজ তথা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে যারা কাজ করে যাচ্ছে তাদের মধ্য থেকে আমাদের বাছাই করতে হবে হক দলটি এবং তাতে যুক্ত হয়ে দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য কাজ করতে হবে। কারণ- এটাই আল্লাহর হুকুম ও ফরজ ইবাদাহ।

কিছু দল আছে যারা আবার কোনদিকেই নেই, যেমন আহলে হাদিস আন্দোলন। যারা ইসলামী শরীয়ত ও দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক চায়। তবে তারা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ পদ্ধতিতে চায় না। তারা মনে করে সরকার গণতন্ত্রের মত কুফুরি মতবাদে শাসন করলেও সরকার মুসলিমই থাকে, তাই সেই শাসকের আদেশের বাহিরে এটা করা যাবে না। কিছু করলে নাকি সেটা বিদ্রোহ হবে। আর বলত- শেখ হাসিনা তাগুত নয়, সে মুসলিম। তাদের ফতোয়া অনুযায়ী- যেমন বাংলাদেশে ২০২৪ সালে একটি বিদ্রোহ (জুলাই বিপ্লব) হলো কিন্তু এখন আহলে হাদিস তাদের আর বিদ্রোহী বলছে না। বলছে বিপ্লবী; সাথে আরো তাদের যে পরিভাষাগুলো আছে সেগুলোও। অর্থাৎ তারা সকলের কাছেই গোল আলু হয়ে থাকতে চায় যাতে তাদের অস্তিত্বের উপর কোন আঘাত না আসে। সেভাবেই তারা ইসলাম পালন করতে চায়। আবার আহলে হাদিস দলটি গণতন্ত্র ও ভোটযুদ্ধের বিরোধী। যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক এটি বাতিল মতাদর্শ। কিন্তু যখন বলা হয় কোন মাধ্যমে আর কিভাবে ইসলাম কায়েম করা যায় তখন তারা বলে- কুফর দিয়ে পৃথিবী ভরে গেছে, দাওয়াত দিয়ে দিয়ে তাদেরকে ইসলাম আর তাওহীদ বুঝাতে হবে, তারা তাওহীদ বুঝলে দ্বীন এমনিতেই কায়েম হয়ে যাবে (ড আবু বকর জাকারিয়ার বক্তব্য)। তাদের মুখে জিহাদ কিংবা কিতালের কোন কথা উচ্চারিত হয় না এ সময়। কারণ জানে এটা বললে কুফর শক্তি এদের পিছনে লাগবে। তাই তাদের শেষ কথা দাওয়াত দিয়ে মানুষকে আগে তাওহীদ বুঝাতে হবে, তাহলেই দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে। তারা মূলত বুঝাতে চায় অধিকাংশ দ্বীন বুঝলে এমনিতেই দ্বীন ইসলাম কায়েম হবে। যদিও দাওয়াত দিয়ে তাওহীদ বুঝাতে হবে সঠিক কথা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তাওহীদ গ্রহণ করবে না, অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনবে না যে বিষয়ে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন, সেটা কুরআনের আয়াত আর তখন তাদের মাথায় থাকে না। তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে এরপর তাওহীদপন্থীদের নিয়ে জিহাদ-কিতাল করে যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেটা আর বলে না। যখন যেমন সরকার থাকে তাদের সাথে মিলমিশ করেই তারা থাকতে চায়, শাসকের সুদৃষ্টি যেন তাদের উপর থাকে এই জন্য তারা হক কথা বলা থেকে বিরত থাকে। বলে থাকে- সরকার প্রধান

ইউনুসকে তাওহীদ বুঝাতে পারলেই তো হল, দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে তাঁর মাধ্যমে, আমাদের ক্ষমতায় যাওয়ার দরকার নেই (ড আবু বকর জাকারিয়ার বক্তব্য)।

মূল কথা এরা জান ও মাল হেফাজত করে কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ পদ্ধতি বাদ দিয়ে জিহাদের অন্য যে পদ্ধতি আছে সেগুলো দিয়ে দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে চায়। তাদের কাছে লেখনী, বক্তৃতা ও দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই হচ্ছে জিহাদ। এবং এভাবেই নাকি দ্বীন ইসলাম কায়েম হবে। অথচ দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে যে মূল পদ্ধতি রয়েছে তারা সেই পদ্ধতির কথা ভয়ে উচ্চারণও করে না। এবং তাদের কিছু আলেম লোক মনে করে এটা সন্ত্রাসী কার্যক্রম। তাই এরাও বাতিল ফিরকা তথা বাতিল জামায়াতের মধ্যেই গণ্য।

অতঃপর রাজনীতির মাঠ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকা দল তাবলীগ, যাদের প্রধানরা চায় দ্বীন ইসলাম কায়েম হোক, কিন্তু তারাও সশস্ত্র যুদ্ধ তথা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ কে পছন্দ করে না। তারা মনে করে দাওয়াত দিয়ে ইসলামে মানুষকে প্রবেশ করিয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়বে। তারা রসূল ﷺ এর চেয়েও ইসলাম সম্পর্কে বেশি বুঝে, কারণ রসূল ﷺ যুদ্ধ করে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিল, বাতিলদের মোকাবেলা করেছিল। আর এরা বলে এর দরকার নেই। এরা ইসলামী দাওয়াতী কাজ করছে, অনেক সময় এর মাধ্যমে কিছু মানুষ ইসলাম জানার সুযোগ পাচ্ছে। এটা ভালো দিক হলেও দাওয়াত দেওয়ার কর্মপন্থাগুলোও বিদআত এর অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে অনেক আলেমদের ফতোয়া আছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এই দাওয়াতকেই তারা জিহাদ মনে করে, আল্লাহর রাস্তায় সময় ব্যয় মনে করে। এর ফলে তারা দ্বীন ইসলাম কায়েমের মূল পদ্ধতিকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে বিদআতি হয়ে যায়, দ্বীন ইসলামের হক জামায়াত থেকে বের হয়ে নতুন ফিরকা হিসেবে পরিচয় লাভ করে। তাই এই দলটিও লিস্ট থেকে বাদ।

অতঃপর আরো একটি দল যাদেরকে হিজবুত তাহরীর বলা হয় যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক চায়, তবে চায় আমেরিকান পদ্ধতিতে (অর্থাৎ কথার মারপ্যাঁচ/ অর্থনৈতিক কিংবা অন্যভাবে লড়াই), বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ও শুধু

দাওয়াহ এর মাধ্যমে। কোন ধরণের ভায়োলেন্স তারা চায় না (তাদের বক্তব্য), অর্থাৎ নিজেরা যুদ্ধ করতে রাজি না, রাষ্ট্রপ্রধান ও সামরিক বাহিনীকে বুঝিয়ে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের মত পরিচালনা করার তাকিদ দিবে। যদিও কিছুটা ভালো দাওয়াহ ই মনে হয়, কারণ ইসলামের দাওয়াহ তো সকলের জন্য। কিন্তু তাদের চাওয়া শুধুই মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ নিজেদের মধ্যেই তারা ইসলামকে ঠিকভাবে পালন করে না। ইসলামী বিধিবিধান নিজেরা পালন না করে আরেকজনকে সেটা করতে উপদেশ দেওয়া আর সেই উপদেশে কোন কাজ হবে, এটা কোন মূর্খও কি বিশ্বাস করবে? অসংখ্য ওয়াজিব বিধান তরক করে এই দলের লোকেরা; আর এই দলের লোকদের দেখলেই চেনা যায় যে এরা ইসলাম নিজের শরীরে কতটুকু পালন করে। দাড়ি রাখা এদের ঐচ্ছিক বিষয়, প্যান্ট টাখনুর নিচে পড়া যেন এদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেওয়া, সিগারেট খাওয়া, তাস খেলা-দাবা খেলা এগুলো তাদের কাছে কোন ইসলামের নীতি সাংঘর্ষিক বিষয় মনে হয় না, এরকম আরো কত বিষয় আছে সেগুলো তারাই ভালো জানে। এদের আকীদাহ এর বিষয়ও যে কেমন হবে তাও এসব কাজ দিয়ে অনুমান করা যায়। অতঃপর, আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে বিজয় দান করেন না। তাই এই জামায়াতও বাতিলের কাতারে। আর উপরে বর্ণিত এসকল দলগুলো কিতাল-যুদ্ধকে অপছন্দ করার বিষয়কে আল্লাহ আগেই কুরআনে বলে দিয়েছেন-

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২১৬)

এরকমই আরেকটি দল 'আল্লাহর দল' যারা হাদিস মানে না, শুধু কুরআন মানে। নামাজ পড়ে ৩ ওয়াক্ত, কারণ তারা ৫ ওয়াক্ত এর কথা নাকি কুরআনে খুঁজে পায় না। এরা যদিও মুখে বলে দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে চাই জিহাদ করার মাধ্যমে তাই প্রশাসনও এদেরকে বন্দী করে রাখে কিন্তু এরা যদিও কিতালের পথেও বের হয় (যদিও আর বের হওয়ার মত সামর্থ্য এদের নেই, জামায়াত ভেঙ্গে বিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে), তাও কখনো এদের

দ্বারা সঠিক ইসলাম কায়েম হবে না। কারণ হাদিস না মানলে, রসূল ﷺ এর সুন্নাহ ও পদ্ধতি না মানলে সে ইসলামের মধ্যেই আর থাকে না। তাই তারা যা কায়েম করবে তা ইসলামী শাসন হবে না। তাই এই দলও বাতিল।

অতঃপর আরেকটি দল হিযবুত তাওহীদ অর্থাৎ তাওহীদের দল। নামে তাওহীদের দল হলেও এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে আসলে কি সেটা বোঝা বড় দায়। তবে তারা যে সশস্ত্র যুদ্ধ তথা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম কায়েম চায় না, সেটা স্পষ্টই করে দিয়েছে। ইসলামের ওয়াজিব ও ফরজ অনেক বিধানকে নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে পালন করছে। সামনে এরা নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করবে নাকি এরকম দলীয় দাওয়াত দিয়ে, টাকা খরচ করে, খাইয়ে লোক বাড়িয়ে অভ্যুত্থান করবে তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তারা মূল ইসলামকে বিকৃত করছে এ বিষয়ে দেশের সকল ওলামায়ে কেরাম একমত এবং বর্তমানে বড় একটি বাতিল ফিরকারূপে এর অবস্থান রয়েছে। তাই এটিও বাতিল। কারণ হিসেবে একটাই যথেষ্ট হয় যে- কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের জন্য এরা কাজ করছে না। এদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। যেহেতু মুখে বলে দ্বীন ইসলাম চাই, একারণেই এই দলের নাম নিয়ে আসা, যদিও অনেক বিশ্লেষণে দেখা যায় এদের এই উদ্দেশ্যও নেই। শুধুই মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করার একটি ফন্দি এটি। নারীদের অধিকার, পর্দা, নামাজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তারা এমন সব ব্যাখ্যা নিয়ে আসে যা ইসলামের মূলের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন করে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করে থাকে এদেশের নেশাগ্রস্ত বাউল শিল্পীরা।

অনেকেই এসব ভিন্ন ভিন্ন পন্থায়, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে মূলত নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চায়। কারণ প্রকৃত মুমিন ছাড়া কে ই বা যুদ্ধ করে নিজের জান দিতে চায়? আর যুদ্ধ এটা সবার জন্যই একটি ভয়ের বিষয়। তাই যুদ্ধের জন্য মুমিনদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। যেমন আয়াতে বলা আছে-

হে নাবী; মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর (উৎসাহ দিন); তোমাদের মধ্যে ২০ জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা ২০০ জনের উপর বিজয় হইবে এবং তোমাদের মধ্যে ১০০ জন থাকিলে ১ হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায়, যাহার বোধশক্তি নাই। আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বল আছে সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্য্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদের মধ্যে ১ হাজার থাকিলে আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে তাহারা ২ হাজারের উপরে বিজয়ী হইবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরহ আনফাল, আ: ৬৫-৬৬)

তাই ইতিহাসে বারবার পরিক্ষিত সফল পদ্ধতি কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমেই দ্বীন কায়েমের আশা রাখতে হবে। তাহলেই সফল হওয়া যাবে এবং সঠিক হক জামায়াতেও যুক্ত থাকা যাবে। আর আল্লাহ দেখবেন না যে আমি সফল হলাম কিনা, বিজয় আনলাম কিনা। আল্লাহ দেখবেন আমি কতটুকু সঠিক পথে থেকে প্রচেষ্টা করেছি।

রসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম হা/১৯১০, মিশকাত হা/৩৮১৩)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহবান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে (প্রয়োজনে হিজরত করবে)।' (মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)

সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জিহাদের বাসনা ও শহীদী মৃত্যুর কামনা থাকা জরুরী। অবশ্যই সে জিহাদ হতে হবে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত জিহাদ।

''আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে বা সাহায্য করবে না; তাতে

তাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ এসে যায়।'' (সহিহ মুসলিম, ১৯২০)

উপরের হাদিসে জিহাদ শব্দ আসে নি, সরাসরি কিতাল শব্দ এসেছে। আর এর অর্থ যুদ্ধ। আর যা সশস্ত্র হয়, জান ও মাল প্রয়োজন হয়। তাই হক জামায়াতের মূল বৈশিষ্ট্য ও দ্বীন ইসলাম কায়েমের পদ্ধতিই হবে রসূল ﷺ এর পদ্ধতি তথা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ। আর আল্লাহ তায়ালাও বলেন-

''তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যতটুকু শক্তি সম্ভব প্রস্তুত রাখো এবং যুদ্ধের ঘোড়া, যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের শত্রুকে ভয় দেখাতে পারো''। (সূরা আল-আনফাল ৮:৬০)

অতঃপর হক দলের মূল বৈশিষ্ট্যের একটি পাওয়া যায় যে তারা যুদ্ধ করবে যেমন হাদিসে আরো এসেছে-

''আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হক-এর উপর লড়াই (যুদ্ধ) করবে। তারা শত্রুপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে''। (আবু দাউদ ২৪৮৪, মিশকাত ৩৮১৯)

কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ মানহায / পদ্ধতির উপর যেসকল দল রয়েছে তাদের আকীদা-মাজহাব জানার মাধ্যমে জামায়াত বাছাই

একটি দল ও দলপতির আকীদা-বিশ্বাস ও তাওহীদ বিষয়ে জ্ঞান, মানহাযের বিষয়ে ধারণা, চরমপন্থী নাকি নরমপন্থী এসকল বিষয় জানা অত্যাবশ্যক বিষয়। কারণ লক্ষ্য- দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও পদ্ধতি- কিতাল এর পথে হলেও যদি আকীদা ভুল হয়, তাওহীদ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকে তাহলে সেই দল কখনোই সফলতা লাভ করবে না। তাদের অবস্থা হবে ডাকাত দলের মত যারা শুধু হত্যা-বিশৃঙ্খলাই করে। আল্লাহ তাদের কোন সাহায্য করবে না আর তারা ক্ষমতা পেলেও তা কখনো ইসলামী সাম্রাজ্য বা ইসলামী শাসন হবে না। তাই অবশ্যই আকীদা ও তাওহীদ সম্পর্কে তারা

কি ধারণা রাখে সেটা জানার মাধ্যমেই কোনো জামায়াতে যুক্ত হতে হবে, জামায়াতবদ্ধ হতে হবে। এর আগে যাচাই-বাছাই চলতে থাকবে।

অতঃপর ইমাম মাহমুদ এর কাফেলা, জামাত-উল-মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হারকাতুল জিহাদ (হুজি) ও এরকম আরো মিত্রদলগুলো (হরকাত-উল-মুজাহেদিন, লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মোহাম্মদ, হাক্কানি নেটওয়ার্ক, পাকিস্তানি তালেবান, এশিয়ান টাইগার্স, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন), এরপর তালিবান, টিটিপি, আল কায়েদা, বাংলাদেশে আরো কিছু একইপন্থী গ্রুপ- আনসার আল ইসলাম, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ইত্যাদি।

এসকল দলগুলোর পদ্ধতি কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ। তবে এখন বর্তমানে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে এবং তাদের নেতা কে সেটাও সঠিকভাবে যাচাই করার কোন মাধ্যম নেই, তাই সেগুলো লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বাদ দেওয়ার জন্য অন্য আরো কারণ থাকলেও তা আর দরকার হচ্ছে না একারণেই যে, সেই দলগুলো এখন আর তাদের সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না, পিছিয়ে গেছে এবং দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আছে। এখন অস্তিত্ব বিলীন অবস্থায় আছে (যদিও তাদের নেতা, উপনেতা কিংবা কর্মীদের ভুলের কারণে বা কর্মপদ্ধতি ভুল হওয়াও অনেকে কারণ মনে করে)। যেমন- হুজি, জেএমবি। এগুলো পুরানো জামা'আত, যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও এক সময় ছিল দ্বীন ইসলাম কায়েম এবং পদ্ধতি ছিল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ, কিন্তু কর্মপদ্ধতিতে ভুল, শত্রুপক্ষের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং ভালো নেতার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ভ্রষ্ট-অযোগ্য নেতাদের আগমন ও দলে নেতা-উপনেতা নিয়ে ক্রন্দল, কর্মীদের ভুল ও আরো বিভিন্ন কারণে এই দল এখন বিলুপ্ত। আর এসকল দলের এখন কোন দাওয়াহ নেই, কোন নেতার খোঁজ পাওয়া যায় না, দ্বীন কায়েমের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না, অর্থাৎ তাদের বেশির ভাগ এখন এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত, হয়তো যোগ্য কোন নেতা নেই। হুজি ও জেএমবি থাকাবস্থায় তালিবান, আল কায়েদাও ছিল। তবে আঞ্চলিকভাবে এখানে তেমন প্রভাব তাদের (AQ এর) ছিল না। আর আমরা বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশ নিয়েই আলোচনা করছি।

অতঃপর বাংলাদেশ ও ভারতীয় এলাকাতে আনসার আল ইসলাম নামে একটি জামায়াত রয়েছে এবং কিছু সূত্র অনুযায়ী যার পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নাম রাখা হয়। আবার কেউ বলে দুটি আলাদা দল। তবে আলাদা দল বিষয়ের দলিল দুর্বল, তাও আমরা আলাদাই ধরে নিলাম এখানে। কিছু সূত্র মতে জানা যায় এটি আল-কায়েদার ভারতীয় কিংবা বাংলাদেশি শাখা হিসেবে চলে। আবার অন্যসূত্রে জানা যায় এই দলের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্কই নেই।

ভারতের জন্য আল-কায়েদা ২০১৪ সালে AQIS (আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট) নামে শাখা ঘোষণা করে।

• এই শাখার লক্ষ্য হল ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিয়ানমারসহ পুরো উপমহাদেশে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম চালানো এবং জামাআতের সম্প্রসারণ।

• কিছু রিপোর্ট এ দেখা গেছে, ভারতের তাগুত সরকার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে 'Ansar al-Islam' বা সংশ্লিষ্ট সদস্যদের আল-কায়েদার সাথে লিংক আছে বলে মামলা দেখানো হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশেও দেখিয়েছে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আল-কায়েদার মাধ্যমে কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করার বিষয়টি একদমই দেখা যায় না। বরং বলা যায়, তারা আল কায়েদাকে হক জেনে, তাদের প্রতি সহমত পোষণ করে নিজেরা নিজেরা এই জামায়াত এর প্রতিষ্ঠা করে। কারণ, তারা জানত দ্বীন কায়েমের জন্য কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর উপর থাকা দলই হক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অতঃপর তাদের আকিদা, মানহায দেখলে পরের বিষয়গুলো আরো পরিস্কার হয়ে ফুটে ওঠে। এ থেকে বর্তমান অবস্থা এটাই স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশে এসকল নামের দলগুলো সরাসরি আল-কায়েদার কোন শাখা না, আল কায়েদা হতে নির্দেশ নিয়েও পরিচালনা হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর আল কায়েদা সাপোর্ট করার কারণে অনেক সময় তাগুত প্রশাসন সরাসরি আল-কায়েদা নাম ব্যবহার না করে এই সকল দলের নাম (আনসার আল ইসলাম, আনসারুল্লাহ) ব্যবহার করেও এ সকল দলের পরিচিতি বেশি ঘটিয়েছে। আর এসকল অনুসারীরা তালিবানকেও হক দল

হিসেবে জানে। কারণ ইতিহাস মতে তালিবানের কাছে আল-কায়েদা আনুগত্যের বায়াত নেওয়া, সেই হিসেবে তা একই সূত্রে গাঁথা।

এবার যদি বাংলাদেশের এই দুই দল নিয়ে বলি তাহলে এদের একটি বড় পরিচয় এরা হানাফী। এরা মাজহাবের দিক দিয়ে এ বিষয়ে কট্টরপন্থী। যদিও আল-কায়েদার বেশির ভাগ নেতারাই হচ্ছেন সালাফী মানহাজের। কিন্তু তারা আল-কায়েদার সেই নেতাদের মানহাজ অনুসরণ করে না একারণে যে তারা মাদ্রাসায় ও দেশীয়ভাবে শিক্ষা পেয়েছে যে এটাই সঠিক, আবার তালিবান তারা বেশির ভাগ হানাফী মাজহাবের। আর আল-কায়েদাও এখানে কৌশল হিসেবে নাকি বলেছে- যে এলাকায় যে মাজহাবের বেশি লোক সেই মাজহাব অনুসরণ করার বিষয়ে, যাতে নতুন ফিতনা এড়ানো যায়। এই কথা হচ্ছে তাদের জন্য যারা কঠোর এ বিষয়ে। কিন্তু পরিস্থিতির জন্য কিছু করা যাচ্ছে না। আর ঠিক সেই বিষয়টির মতোই এরা মাজহাব বিষয়ে কঠোরপন্থা অবলম্বন করে থাকে। সালাফীদেরকে এরা ভিন্ন চোখে দেখে। যদিও আল-কায়েদার সালাফী নেতারা হানাফী কিংবা অন্য মাজহাবের কাউকে ভিন্ন চোখে দেখেনি। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে দলবদ্ধ থেকেছে, জিহাদ করেছে।

অতঃপর এই দুই দলের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল- বাংলাদেশ জিহাদের জন্য উর্বর না, এখানে জিহাদের পরিবেশ, অবস্থা নেই। তাই তারা এদেশে দাওয়াহ এর কাজ করে বিশ্বে যেসকল জায়গায় জিহাদ চলমান আছে সেখানে হিজরত এর জন্য লোক তৈরি করা, তালিবান ও আল-কায়েদা যে হক দল তা প্রচার করা এবং অনুসারী তৈরি করা এবং দেশের মানুষকে জিহাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করা। দ্বীন ইসলাম কিভাবে কায়েম হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচার-প্রসার করা।

বিষয়গুলো শুনতে ভালো শুনালেও এই সকল দলের যারা নেতৃত্বস্থানীয় দাবি করে তার মধ্যে আসল কারা আর নকল কারা সেটা বোঝারও কোন উপায় নেই। যেহেতু তারা নিরাপত্তা নিয়েই শঙ্কিত থাকে, তাই একজনকেও পাওয়া যায় না যে বিশ্বস্ত হতে পারবে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে। এমনও সূত্র পাওয়া গেছে যে র‍্যাব এর লোকেরা এই দলের প্রধান সেজে

অনুসারীদের সাথে প্রতারনা করে গেছে। আবার যাদেরকে মূলত দলের মাথা ধরা যায়, এমন লোকদের অনেকে জেলখানায় বন্দি এবং দেখা যায় অনেক লোক স্পষ্টভাবে বিভিন্ন প্রতারনা ও ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত। নেতা, উপনেতাদের অর্থ আত্মসাৎ করার মত বিষয়ও অনেক ধরা পরে। আর বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা শুধু সেই নীতি-মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচারণা চালিয়ে নিজেদের নেতা বানিয়ে অনুসারী গুছাচ্ছে। বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ করছে, প্রস্তুতির কথা বলছে, কিন্তু আসলেই তারা কি করতে চাইছে, কি করবে তা আর স্পষ্ট হয় না। তবে শুধু দাওয়াহ ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট না। তারা নেতা সাজছে কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি নেই, কি আদেশ দিবে সেটাও তাদের জানা নেই। নেই চেইন অফ কমান্ডও।

সব বিষয় বাদ দিয়ে ধরে নিলাম এটি আরো যাচাই বাছাই করতে হবে সময় নিয়ে, আরো আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে (যদিও কেউ যদি এই দুই দল যাচাই-বাছাই করতে বের হয় তাহলে সে এখন এই দলের কোন কুল কিনারাই খুঁজে পাবে না বলে মনে হয়)। তাই পরের জামায়াতগুলো দেখি।

অতঃপর ২০১৪ সালে আল-কায়েদা যখন সিরিয়া ও ইরাকের বিশাল ভূমি দখল করে তখন এই জামায়াতের কিছু লোক বিদ্রোহ করে বসে তৎকালীন আমীরের আদেশ না মেনে। তখন তারা খিলাফত ঘোষণার নাম করে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে ময়দানে নামে এবং তারা সেই দখলকৃত জায়গার নাম দেয় ইসলামিক স্টেট তথা আইএস এবং আইএসআইএস ও একটি নাম। অতঃপর সেই বিদ্রোহী দলটির অবস্থা দেখে সেই হাদিসগুলোর মিল পাওয়া শুরু হয় যা রসূল ﷺ খারেজিদের বিষয়ে বলেছিল। অতঃপর তারা নিজেরা খলীফা ঘোষণা করে নিজেদের মত বায়াত নেওয়া শুরু করে। আবার প্রচার করে খলীফা কুরাইশিও। তাদের জাঁকজমক দেখে বিশ্বের অনেক দেশে শুরু হয় অদেখা বায়াত, মনে মনে বায়াত ও ভিডিও এর মাধ্যমে বায়াত এবং সে ভূমিতে হিজরত এর বিষয়। তাদের মুখে একথা ঠিকই ছিল যে দ্বীন ইসলাম কায়েম করছি আমরা, এবং কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমেই যা হক দলের বৈশিষ্ট্যের একটি, কিন্তু দেখা যায় এরা বড় ধরণের বিদ্রোহী,

আর রসূল ﷺ এর বলা খারেজি গোষ্ঠীর লোকজন। বিষয় টা এমন যে ডাকাতি করে গরু নিয়ে সেটা দিয়ে কুরবানী দিয়ে লোকদের দেখানো ও বন্টন সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টিও কামনা করা। এ থেকেও এটি বুঝা যায় যে শুধু মুখে মুসলিম দাবী করে গেলে, দ্বীনের কথা বলে গেলে আর শুধু যুদ্ধ করে গেলেই হক জামায়াত প্রমাণিত হয় না। আদর্শ, আকীদা কর্মকান্ডগুলো রসূল ﷺ এর সুন্নাহ মোতাবেক হচ্ছে কিনা সেগুলোও দেখে যাচাই করতে হয়। এটি না বুঝে বাংলাদেশেও তৈরি হয় বিদ্রোহী আইএস এর অনুসারীদের উৎপত্তি। যার প্রথম দিকেই রয়েছে জেএমবি দলের বেশি বোঝা অনুসারীগণ ও কিছু উপনেতাগণ। যখন এই দলের মূল কিছু নেতারা তাগুত-জালিমের রোষানলে পতিত হয় ও দল প্রায় বিলীন অবস্থা, এর সাথে আবার দেখতে পায় অন্য দল অন্য জায়গায় খিলাফতই ঘোষণা করে ফেলছে, তখন খারেজি আকিদার অনুগামী এসব লোকজন আইএস এর উপর বায়াত নিয়ে আইএস এর অনুসারী হয়। যখন তারা দেখেছে যে জেএমবি এর আর অস্তিত্ব নেই, কিংবা নেতৃত্বশূন্য তখন তারা এই কাজ করে তা থেকে বের হয়ে আসে ও আগের জামায়াতে ফিতনা সৃষ্টি করে। এবং একারণেই আইএস এর অনুসারীদেরকে সরাসরি প্রশাসন আইএস নাম না দিয়ে বলে- নব্য জেএমবি। আর এরা উগ্রজাতের লোকদের একটি দল। এজন্য খারেজিদের আকিদা-মানহাজগুলো জানা খুবই জরুরী। কারণ এরা দেখতে মুসলিমই মনে হবে, কুরআন তিলায়াত, ইবাদাত খুবই সুন্দর হবে কিন্তু ইসলাম থেকে এরা বের হয়ে যাবে এমন ভাবে যেভাবে তীর কোন বস্তুকে ফুঁড়ে চলে যায়। (সহিহ মুসলিম)

তাই আইএস এর মত কোন দলেও যোগ দেওয়া যাবে না। কারণ এরা খারেজি আকিদার ও চরমপন্থী, ইসলাম সম্পর্কে চরম জ্ঞানহীন। এ বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে উলামায়ে কেরামদের, যারা বিভিন্ন ফ্রন্টে যেমন উদাহরণ হিসেবে আল কায়দা বা অনুরূপ জামায়াতের আন্ডারে জিহাদ করেছে বা এ বিষয়ে জ্ঞানী। আর বর্তমান অবস্থায় এই আইএস এখন বিলুপ্ত এক দল, যার আনুষ্ঠানিক পতন ধরা হয় ২০১৭ সালের শেষের দিকে। কিন্তু এই খারেজি মতাদর্শের উগ্র, কট্টর কিছু লোক মুসলিম নামে ঠিকই

রয়ে গেছে যা আরো অনেক দিনই থাকবে। এরকম লোকদের থেকেও সাবধানে থাকা উচিত মুসলিমদের। আর রসূলও ﷺ বলেছেন, এসকল বেশি বোঝা খারেজি আকিদার খারেজিদেরকে হত্যা করা মুসলিমদের একটি দায়িত্ব। একটি হাদিসে এসেছে-

> আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) নবী ﷺ-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা ইবনু হানযালী যিনি মাজায়েশী গোত্রের লোক ছিলেন। (২) উআইনা ইবনু বাদার ফাযারী। (৩) যায়েদ ত্বায়ী, যিনি পরে বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন। (৪) আলকামাহ ইবনু উলাছাহ আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী ﷺ নজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গন্ডদ্বয় ঝুলে পড়া, কপাল উঁচু, ঘন দাড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন, আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, আমি তাকে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ বলে ধারণা করছি। কিন্তু নবী ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর যখন অভিযোগকারী লোকটি ফিরে গেল, তখন নবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দ্বীন হতে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে আর মুর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম। (বুখারী হা/৩৩৪৪, বঙ্গানুবাদ বুখারী, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৩৮০ পৃঃ; মুসলিম হা/১০৬৪)

অতঃপর তালিবান ও আল-কায়েদা। ইতিহাসসূত্রে জানা যায় তালিবানের নেতা মোল্লাহ ওমর এর মাধ্যমে এই জামায়াতের সূচনা এবং তার কাছে আল-কায়েদা প্রধান আনুগত্যের বায়াত নিয়েছে। এবং আফগান জিহাদে একসাথে নেতৃত্বও দিয়েছে। মোল্লাহ ওমর ছিলেন একজন সালাফী মাজহাবের লোক, মধ্যমপন্থী তবে আফগানের সাধারণ মুসলিমরা যোদ্ধা

জাতি হলেও তাদের মধ্যে ছিল অনেক বিদআত, কুসংস্কার, কট্টর মাজহাব পালনকারী। যা এখনো অনেকটা সেরকমই আছে। তবে আফগান জিহাদে বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে আরব দেশের অনেক লোক অংশগ্রহণ করে যারা ছিলেন সম্পূর্ণ সালাফী মানহাজের। একটি বিষয় স্পষ্ট করে রাখি তা হচ্ছে- বর্তমানে বাংলাদেশে আহলে হাদিস দাবীদার জামাআতটি তথা এ দলটি অনেক সময় নিজেদের সালাফী দাবি করে। আদতে এই আহলে হাদিস মতাদর্শের সালাফী তারা ছিল না। তারা ছিল প্রকৃত সালাফী। যারা জিহাদ-কিতাল এর মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতেন, সাহাবীদের-তাবীঈদের রাস্তাই অনুসরণ করতেন। উদ্ভট কোন চিন্তা তারা করতেন না, শাসকের গোলামি করতেন না যেমনটা আহলে হাদিসরা করে থাকে। আর সেই আফগান যুদ্ধে যুক্ত হওয়া লোকজনও নিজেদের আহলে হাদিস বলে পরিচয় দিতেন না। মুসলিম হিসেবেই পরিচয় দিতেন, তবে তারা মাজহাবের দিক দিয়ে সালাফী ছিলেন এজন্য যে, সালাফরা তথা পূর্বে গত হওয়া পুণ্যবান ও তাকওয়াবান (সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ) লোকদের অনুসারী ছিল। তারা কুরআন-হাদিসকে যেকোনো মতামতের উপর প্রাধান্য দিতেন। কোন ইমাম বা মাজহাবের অন্ধ অনুসরণ করতেন না। অতঃপর বর্তমানে ২০২১ সাল থেকে আফগানে তালিবান দ্বারা শাসন পরিচালনা হচ্ছে। তারা একে ইমারতে ইসলামিয়াহ বলে থাকে।

অতঃপর আল-কায়েদা বিশ্বব্যাপী জিহাদের সূচনা করার জন্য পরিচিত। তাদের সূচনালগ্নে নেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ আযযাম এবং পরবর্তীতে ওসামা বিন লাদেন, যিনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন জিহাদের ময়দানে। তাদের আকিদা ও মানহাজ হক কিংবা হকের কাছাকাছি। তারাও চায় দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য, কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ পদ্ধতিতেই। আর আকিদায় মানহাজে সালাফি, মধ্যমপন্থী। এটিও এক নেতার আন্ডারে চলে। যার নেতার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ঘোষণা পাওয়া যায়। আল-কায়েদার বর্তমান হলেন মিসরীয় বংশোদ্ভূত সাইফ আল-আদেল। ২০২২ সালে আয়মান আল-জাওয়াহিরির মৃত্যুর পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়।

অতঃপর জামায়াত বাছাইয়ে শেষে মূলে থাকে তালিবান, আল-কায়েদা (এবং এর যদি কোন শাখা থাকে) ও ইমাম মাহমুদের কাফেলা।

এখন দলের আলোচনা করার আগে দুইটি বিষয় জেনে রাখা উচিত-

১। অঞ্চলভেদে হক দল আলাদা থাকতে পারে এবং থাকাটা স্বাভাবিকও। কারণ সব জায়গায় (বিশ্বে) দ্বীন ইসলাম কায়েম করার জন্য আগে নিজের জায়গা থেকেই, নিজের বাড়ি, নিজের অঞ্চল থেকেই দ্বীন ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করা উচিত, এটাই নিয়ম। যেমন ইসলামের দাওয়াহ এর ক্ষেত্রেও আগে নিকট (আত্মীয়) জনদের কাছে দাওয়াহ দেওয়া উচিত, আবার কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও আগে নিকটতর কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা উচিত। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত রয়েছে ও রসূল ﷺ এর হাদিস রয়েছে। যদি কোন অঞ্চলে সেই অবস্থা না থাকে তখন হিজরতের বিষয় আসে এবং হিজরত করে দ্বীন ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করে যেতে হবে। তবে যদি নিজ অবস্থানেই হয় তাহলে সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। অন্য অঞ্চলে যদি জিহাদ চলমান হয়, তাহলে সেখানে সাহায্য-সহযোগিতাও একটা বড় কাজ। এভাবে অঞ্চল ভেদে হক দল আলাদা হতে পারে, আলাদাভাবে কার্যক্রম চালাতে পারে। এবং যখন অঞ্চলসমূহ এক হয়ে যায়, ইসলামের আন্ডারে চলে আসে তখন সেই দুই হক দল এক হয়ে একটি দলে রূপ নিতে হবে, কারণ ইমারত গঠন করা হলে তখন নেতা একাধিক হতে পারবে না। অর্থাৎ তখন নেতা একজন হতে হবে।

২। হক দল এক হয় মূলত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আকিদা-মানহাজ যখন একই থাকে। তখন সেই দল দুটি এক হয়ে কোন এক নেতার আনুগত্যে আসবে যতক্ষণ সেই নেতা হকের উপর থেকে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। এখন এখানেই একটি সমস্যা দেখা যায় যে- কোন দল, কোন দলের নেতাকে বা ভিন্ন কোন নতুন নেতাকে মান্য করবে। যাতে দলটি এক নেতার অধীনে আসে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয়। এটা কিভাবেই বা নির্ণয় করা যায়? এখানে কিছু নীতি অবলম্বন করা যায়, তবে সব সময় এভাবে তা নাও মিলতে পারে-

যেমন আমরা জানি নেতা নির্বাচন হতে হবে যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান, নেতৃত্ব দেওয়ার গুণসম্পন্ন, কৌশলী, ধৈর্য ও ইলম দ্বারা ভরপুর এমন কেউ। একটি বিষয় সব সময় মাথায় রাখতে হবে, তা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে জাননে ওয়ালা মুহাদ্দিস, মুফতি, ফকীহ, আলিম হলেই দল তথা জামায়াতের নেতা হওয়া যায় না। নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ থাকে এমন নেতা দরকার হয়। আর যে নেতার নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ রয়েছে অর্থাৎ নেতা হওয়ার যোগ্য, তাকে আবার ইসলামী জ্ঞানেও পন্ডিত হতে হয়। তখনই সে মুসলিম জামায়াত পরিচালনার যোগ্য হবে।

এখন দুইটি হক দলের মধ্যে যদি ধরা হয় তারা দুজন নেতাই এরকম। তাহলে যারা বেশি পুরাতন সেই দলের নেতার কাছে নতুন দলটি আনুগত্যের বায়াত নিবে। আবার যদি এরকম হয় যে একটি দল তা আঞ্চলিকভাবে নতুন এবং বেশি অনুসারী রয়েছে যেমন এক লক্ষ লোক, তাহলে অন্য দলটিতে যদি অনুসারী কম হয় যেমন ৫০ হাজার লোক, তাহলে সেই দলটি পুরাতন হলেও নতুন দলের নেতার কাছে আনুগত্যের বায়াত নিতে পারে। এতে নেতা পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য যেকোনো বিদ্রোহের হাত থেকে জামায়াত রক্ষা পায়, কারণ অল্প সংখ্যাক বিদ্রোহ দমন করা সহজ বেশি সংখ্যাক বিদ্রোহ থেকে। আবার যদি এরকম দেখা যায় যে দল নতুন, সদস্য সংখ্যাও কম, কিন্তু সে দলের নেতা বেশি মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন, অধিক তাকওয়াবান এবং অন্য পুরানো ও বড় দলের নেতা ও উপনেতাদের এবং অনুসারীদের এ বিষয়ে কোন অভিযোগ নেই তাহলে এভাবেও দল একত্রিকরণ হতে পারে তথা নেতা নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু যদি এই দুইটি হক দলের মধ্যে, এই দুই মুসলিম জামায়াতের মধ্যে কেউ বাড়াবাড়ি করে, কথাতে কোন সমঝোতা না হয় তখন? আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“আর যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে বসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে জুলুম করে, তবে তোমরা সেই জুলুমকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে মীমাংসা

করে দাও এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।'' (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:৯)

অর্থাৎ, যুগে যুগে দেখা গেছে এরকম বাড়াবাড়ি করা দলটি, নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা নেতাদের, অহংকারী নেতাদের আল্লাহ দ্রুতই ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যোগ্যকে বিজয় দান করেছেন। আর সেই হকের উপর থাকা দলটি এরকম অযোগ্য ও অহংকারী নেতার কারণে, ক্ষমতার লোভ করার কারণে, এভাবে জামায়াতটি বাতিলের কাতারে চলে যাওয়ার কারণে নেতা সহ ধ্বংসও হয়ে গিয়েছে। দুইটি দল যারা কিছু মুহূর্ত আগেও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জন করছিল তাদের মধে যারা বাড়াবাড়ি করবে, একতাবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা না করবে, তখনই সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য তাদের উপর থেকে উঠে যায় এবং তারা ধীরে ধীরে পরাজিত দলে পরিণত হয়। তাই সর্বদা নিয়ত ভালো রাখলে, তাকওয়া থাকলে এসকল অবস্থায় সুন্দর ও সঠিকভাবে মুসলিম জামায়াতকে একত্রিত করে টিকিয়ে রাখা যায়।

আর সর্বশেষ একটি বিষয় থাকে যে আল্লাহ প্রদত্ত কোন ইমাম বা আমীরের আগমন হলে তখন সকল হক জামায়াতের জন্য তাদের নেতৃত্ব ছেড়ে সেই আল্লাহ প্রদত্ত আমীরকেই নেতৃত্ব বুঝিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সেই আগের হক জামায়াত যতই পুরাতন হোক, যতই বড় ও কোটি কোটি অনুসারী হোক তাও তাদের তখন এই আমীরকে/ নেতাকে মান্য করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও এই আমীর শুধু একাই একজন হন, তার কোন কিছু না থাকলেও। যেমন উদাহরণ হিসেবে ইমাম মাহদী। যদি প্রকৃত ইমাম মাহদীর আগমন হয় তাহলে পৃথিবীর যত বড় মুসলিম জামায়াতই হোক না কেন, যতই হক জামায়াত হোক সেই জামায়াতের জন্য এবং সেই জামায়াতের নেতাদের জন্য তাদের নেতৃত্ব ছেড়ে অনুসারীর কাতারে যেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং ইমাম মাহদীকে আমীর হিসেবে, নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে। আর নাহলে পথভ্রষ্ট হতে হবে। তাই কেউ এই যুক্তি দিয়ে টিকতে পারবে না যে আমি (আল-কায়েদা) তো ৮০ বছর যাবত যুদ্ধ করছি, বিশাল দল পরিচালনা করছি আর অভিজ্ঞও, আর আপনি মাহদী মাত্র ৪০ বছর বয়স, এখনো কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই নেই, দল পরিচালনাই

করেন নি কোন সময়। এরকম কুযুক্তি দিয়ে উল্টা যারাই বিরোধিতা করবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তার কাছেই মুসলিম জামায়াতের দায়িত্ব দিবেন, অন্য কারো কাছে না। আর যদি অহংকার ও বিরোধিতা করে আনুগত্যের বায়াত না নেয় তাহলে-

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে তার গলায় কোনো (ইমামের) বাইআত নেই, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।" (সহিহ মুসলিম: ১৮৫১)

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়-
মূসা আঃ যখন দ্বীন ইসলাম নিয়ে আগমন করেন তার জাতিতে তখন কিছু লোক তাকে মান্য করে আর কিছু লোক অস্বীকার করে। এরপর মূসা আঃ এর মৃত্যুর পর মূসা আঃ এর আনীত দ্বীন চলতে চলতে সেই হকের অনুসারীদের মধ্যে কিছু বাতিল ঢুকে বিভিন্ন দলে দলে ভাগ হয়ে ফিরকা তৈরি হলো। তবে হকের একটি অংশ রয়ে গেল যারা মূসা আঃ এর আনীত সঠিক দ্বীনই পালন করে যাচ্ছে, অর্থাৎ হক দল যাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন। অতঃপর ঈসা আঃ আগমন করলেন এবং নতুন শরীয়ত ও আসমানী কিতাব নিয়ে আসলেন। এখন সেই মূসা আঃ এর দ্বীন মেনে আসা হক দলের কি করা উচিত? ঈসা আঃ কেই মান্য করা। আর যদি না করে তাহলে কি আর হকের উপর থাকবে তারা? অবশ্যই না। এরপর সেই হক ও বাতিল থেকে যারা পরিশুদ্ধ হয়ে ঈসা আঃ এর আনীত দ্বীনকে মানবে তারাই হক হিসেবে চিহ্নিত হবে। অতঃপর ঈসা আঃ এর মৃত্যুর পর সেই হক দলেরও একই অবস্থা হলো। বিভিন্ন ফিরকা তৈরি হলো। এক ফিরকা বলছে ঈসা আঃ আল্লাহর পুত্র আবার আরেক ফিরকা বলছে ঈসা আঃ ই আল্লাহ (নাউজুবিল্লাহ)। আর একটি দল হকের উপর অটল থেকে ঈসা আঃ কে নবী মনে করেই সঠিক দ্বীন পালন করতে থাকলো। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ আসলেন নতুন দ্বীন ও শরীয়ত নিয়ে। তখন ঈসা আঃ এর দ্বীন অনুসরণকারী হক দলটির করনীয় কি হবে? অবশ্যই মুহাম্মাদ ﷺ কে মেনে নিয়ে তার আনীত দ্বীন পালন করা। কেউ যদি অস্বীকার করে? তাহলে সে সাথে সাথেই হক থেকে ছিটকে বাতিলের কাতারে গিয়ে দাঁড়াবে। একইভাবে রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর খলীফাগণকে মান্য করতে হবে। তাদের

মান্য না করলে কি আর হকের পথে থাকা হবে? যেমন খলীফা আবু বকর রাঃ এর আদেশ মান্য করতে চায়নি, যাকাত দিতে অস্বীকারকারীরা। তারা কি আর হক থাকবে? এখানে যেমন খলীফার আনুগত্যের বিষয় আছে, তেমনই আল্লাহর ও রসূলের আদেশ দেওয়া বিধানের বিষয় আছে। আর সব বিষয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে। রসূল ﷺ এর নিজের কোন ইখতিয়ার ছিল না কোন আদেশ নিষেধে। অতঃপর তিনি বলে গেছেন আমার পরে খলীফাগণ আসবে। আর তারা হবে কুরাইশি। আর তারা থাকাবস্থায় সঠিক দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে এবং দ্বীন ইসলাম সুন্দর-সুচারু ভাবে পরিচালিত হবে। আবার আরেক হাদিসে বলে দিয়েছেন বারোজন আমীর আসবেন, আর তারা কুরাইশী হবেন।

আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... জাবির ইবন সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার পর বার জন আমীর হবেন। জাবির (রা:) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি, তাই আমার কাছে যে ব্যক্তি ছিলেন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, তারা প্রত্যেকেই কুরায়শ গোত্রভুক্ত হবেন।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৩ [ইঃ ফাঃ ২২২৬]; সহিহাহ ১০৭৫; বুখারী ১০৭৫)

হযরত জাবের বিন সামুরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি যে, এই দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তোমাদের মাঝে ১২ জন খলীফাহ না আসে। তারা সবাই তাদের প্রত্যেক উম্মতকে নিজের নিকট একত্রিত করবে। সাহাবী বলেন, তারপর রসূল ﷺ একটি কথা বললেন, তা আমি বুঝতে পারিনাই। আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম রসূল ﷺ কি বলেছেন? পিতা বললেন, তিনি বলেছেন, খলিফাহ সকলেই কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ ৪৫৫৪, ৪৫৫৭, ৪৫৫৮, ৪৫৫৯; আবু দাউদ ৪৯৭৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৩০])

কুতায়বা ইবনু সাঈদ ও আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আমর ইবনু সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু সামুরা (রা:) এর নিকট আমার গোলাম নাফি' মারফত পত্র পাঠালাম যে, আপনি আমাকে এমন কিছু সম্পর্কে অবহিত করুন যা আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট শুনেছেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে লিখলেনঃ জুমার দিন সন্ধ্যায় যে দিন (মা'ইজ) আসলামীকে রজম করা হয়, সেদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, এ দ্বীন অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষন কিয়ামত কায়েম হয় অথবা তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, এদের সকলেই হবে কুরায়শ থেকে।

আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, মুসলমানদের একটি ছোট দল জয় করবে শ্বেতভবন যা কিসরা (কিংবা কিসরা বংশের) মহল। আমি আরও বলতে শুনেছি, কিয়ামতের প্রাক্কালে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে (ব্যয়) শুরু করবে। আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, হাওযে (কাওসারে) আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো।

- (সহীহ মুসলিম ইসঃ ফাঃ ৪৫৬০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের হক আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তাঁর জন্য আবশ্যক যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! দ্বীনের হক কি? তিনি বলেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আর আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের সন্নিকটে (আনুগত্য করবে) থাকবে। এ কথা বলে আল্লাহর রসূল ﷺ সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত পাঠ করে শোনালেন। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১২৫)
- * সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতটি হচ্ছে- হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (মনোনীত আমীর বা নেতা) দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের (কুরআন ও সুন্নাহ) দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

আর যখন তারা আসবে তখন তাদেরকে মানতে হবে। এভাবেই ইমাম মাহদীর বিষয়েও বলেছেন যে তার অর্থাৎ রসূল ﷺ এর বংশ থেকে একজন ব্যক্তির আগমন হবে, তার মাধ্যমে পৃথিবীতে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর মতে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর তিনিও সেই বারো আমীরের একজন যার ব্যাপারে রসূল ﷺ ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন। তাদের আবির্ভাব হলে তখন মুসলিমদের একটিই কাজ, তা হল সকল দল-মত রেখে তাদের আনুগত্য মেনে নিতে হবে।

ইমাম মাহমুদের জামায়াত / ইমাম মাহমুদের কাফেলা / কাফেলা

দ্বীন কায়েমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে, নববী মানহাজ তথা রসূল ﷺ এর পদ্ধতি অনুসারে (কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে) দ্বীন কায়েমের জন্য কাজ করে যাওয়া একটি দল তথা জামায়াত। এই দলকে ইমাম মাহমুদ এর দল, ইমাম মাহমুদের জামায়াত অথবা ইমাম মাহমুদ এর কাফেলাও বলা হয়। ইমাম মাহমুদ এর দল বা জামায়াত বলতে ইমাম তথা আমীর, নেতা এবং মাহমুদ নাম যা এক ব্যক্তির আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জামায়াত, যার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নির্বাচিত হয়। অতঃপর এই জামায়াতের নির্দিষ্ট ঘোষণাকৃত কোন নাম নেই, তবে মুখে উপরের নামগুলো প্রচলিত। আর কাফেলা নামটিও তাগুত প্রশাসনের দেওয়া যখন তাগুত বাহিনী এই জামায়াতের কার্যক্রমকে ব্যাহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল ও জেল-জুলুম করেছিল। তা থেকেই অনেকে ইমাম মাহমুদের কাফেলা নামে চেনে। জামায়াতের কার্যক্রম ও জামায়াতের নেতা সম্পর্কে জানা এবং এই দলের সাথে অন্য দলের পার্থক্য জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যেই দলে তথা জামায়াতে যোগ দিব সেটা নির্ধারণ করতে হলে ধীরে ধীরে গভীর আলোচনা ও বিশ্লেষণে যেতে হবে। এই দলটির সাথে সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে আল-কায়েদার সাথে। তাদের সালাফী মানহাজ, ইসলামী শরীয়ত ও দ্বীনের সকল বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের দিক দিয়ে, আকীদা এবং মাজহাবের দিকও অনেকটা মিল রয়েছে। তবে রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্যও। যা দাওয়াহ এর কিছু বাক্য দেখলেই অনুমান করা যায়-

" বিশুদ্ধ তাওহীদ ও দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাওয়া এই কাফেলাতে যুক্ত হয়ে দ্বীন কায়েমের একজন সাহসী সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলুন। রসূল (স:) কর্তৃক মনোনীত আমীর মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর আনুগত্যে হিন্দের জিহাদে শরিক হয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মাল ও জান ব্যয় করুন।"

রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর

এই একটি বৈশিষ্ট্য যা বর্তমানের অন্য সকল জামায়াত থেকে আলাদা বিষয়। অন্যান্য যেসকল দল বর্তমানে রয়েছে তারা বেশির ভাগ মানুষের তৈরি করা, নির্ধারণ করা নেতা। কিন্তু মাহমুদ বিন আব্দুল কদীর এর জামায়াতটি সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যের এদিক থেকে, কারণ গণমানুষের রায়ের উপর তিনি নেতা হননি। আগেও এরকম আমীরের আবির্ভাব হয়েছে যারা মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত করেছেন, শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। আর রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর এবং দ্বীন সংস্কারক তথা মুজাদ্দিদ এর আগমন হওয়ার যে কয়টি কারণ আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১। তৎকালীন সময়ে কোন দল বা ব্যক্তির মাধ্যমে ইসলামের যে সংস্কার হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না, তারা ব্যর্থ হয়েছে।

২। আল্লাহ কোন বিজয়ের জন্য বা মুসলিমদের ঐক্য করার জন্য আমীর হিসেবে যাকে পছন্দ করেন এবং রসূল ﷺ কর্তৃক তার ব্যাপারে বলে গেছেন, যেমন অমুক ব্যক্তির মাধ্যমেই বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হবে, হিন্দ বিজয় হবে ইত্যাদি। এরকম ক্ষেত্রে মানুষেরা নিজেরা মিলে বানানো নেতা বা দল বা ধারণাকৃত, পছন্দকৃত ব্যক্তির বিষয়টি বাতিল হিসেবে সাব্যস্ত হয়, কারণ আল্লাহ কার মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন সেটা তার ইচ্ছা। এতে মানুষ জোর করে চাইলে কিছু করতে পারবে না।

৩। তৎকালীন সময়ে কোন দল হকের উপর থাকলেও থাকতে পারে তবে এরকম আমীর বা মুজাদ্দিদগণ আগমন করলে তখন তাদের মেনে নিতে হবে। তবে সেই হক দল কোন সময় বৃহৎ পরিসরে প্রভাব রাখা অবস্থায় বা ইসলামের সঠিক লক্ষ্যের দিকে ছোটা অবস্থায় এরকম ইমাম বা মুজাদ্দিদ এর আগমন হয় না। মূলত যখনই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা ও ইসলামী রেনেসাঁ বা পুনঃজাগরণ দরকার ঠিক তখনই এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়।

৪। আবার অনেক সময় মুসলিমদের জামায়াতই রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ও এরকম হতে পারে যখন সেই মুসলিমদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা লোকজন (আমীর-উমারাগণ) কিংবা সমাজে শিরক-বিদআত কিংবা ইসলামের গুরুতর সাংঘর্ষিক কোন বিষয়ের উৎপত্তি হয় এবং তাদের সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এমনকি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভেদে একাধিক ব্যক্তিরও আগমন হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় যারা সেই দুই ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংস্কার করেছেন, দ্বীন ইসলামের রেনেসাঁ সৃষ্টি করেছেন কিংবা তাজদীদ করেছেন।

৫। আর যখন সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কিংবা সারা বিশ্বে কোথাও পরিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে না, সব জায়গায় জুলুম-অত্যাচারে ভরে থাকে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হয় যারা শত্রুর সাথে সরাসরি মোকাবেলা করে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে ইমারত ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। যেমন হাদিসে বলা আছে যখন দুনিয়া জুলুমে ভরে যাবে, ইসলামের শক্তি একদম নিভু পর্যায়ে থাকবে তখন ইমাম মাহদীর আগমন হবে। হাদিসে আরো পাওয়া যায় ইমাম মাহদীর আগমনের আগে তাঁর সহযোগীদের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের মাধ্যমে, তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় হবে এবং সর্বশেষ তারা ইমাম মাহদীর কাছে শাসনব্যবস্থা বুঝিয়ে দিবেন।

আর বর্তমানে যে আমীরের বিষয়ে আলোচনা করছি তার বিষয়টি সহজে বুঝানোর জন্য বলতে পারি-

আমরা শেষ জামানায় আছি। আর আমরা সকলে জানি যে শেষ জামানায় ইমাম মাহদীর আগমন হবে। তার আগমনের আগে কি কি বিষয় ঘটবে সে বিষয়েও বিভিন্ন হাদিসে বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইমাম মাহদীর আগমনের আগে তার সহযোগী দল হিসেবে আরো কয়েকজন ব্যক্তির আবির্ভাব এবং তাদের অঞ্চলভেদে দল থাকা, অর্থাৎ অঞ্চলভেদে তারা মুসলিমদেরকে জামায়াতবদ্ধ করবেন। তাদের উদ্দেশ্য উপরে আমরা

যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা করেছি সেটা থাকার পরেও আলাদা লক্ষ্য রয়েছে যে- ইমাম মাহদীর খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করা এবং ইমাম মাহদীকে খলীফা হিসেবে তার আনুগত্যে মুসলিম জামায়াতকে প্রস্তুত করা। বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায় ইমাম মাহদীর আগমনের কিছু আগেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল মুসলিমদের বিজয় ভূমি হয়ে থাকবে তথা বিভিন্ন ইমারাহ তৈরি হয়ে থাকবে। আর অঞ্চলভেদে তিন জন ব্যক্তির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ রয়েছে হাদিসে। হিন্দ অঞ্চলে ইমাম মাহমুদ, খুরাসান (প্রাচীন) ও তার আওতাধীন বৃহৎ এলাকা (কাজাখিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগান) থেকে শুয়াইব ইবনে ছলেহ এবং ইয়ামান অঞ্চল থেকে ইমাম মানসুর। তাদের মধ্যে দুইজন ইমাম সেই রসূল ﷺ ঘোষণাকৃত বারো আমীরের অন্তর্ভুক্ত। আর যে তিনজনের ব্যাপারে হাদিস এসেছে তারা সকলেই রসূল ﷺ কর্তৃক ঘোষণাকৃত আমীর তথা মুসলিমদেরকে জামায়াতবদ্ধ করবেন। তারা অঞ্চলভেদে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাবেন এবং তাদের হাতে বিভিন্ন অঞ্চল মুসলিমরা বিজয় করবে, যা হাদিসে ঘোষণা দেওয়া আছে। সর্বশেষ তারা সকলে মিলে ইমাম মাহদীর কাছে মুসলিমদের শাসনভার তুলে দিবেন। অঞ্চলভেদে তাদের আত্মপ্রকাশ হলে আমাদেরকে তাদের সাহায্য করা ও মেনে নেওয়া আবশ্যক বিষয়। এছাড়া আমরা হক জামায়াতের সাথে থাকতে পারবো না। যেমন ইমাম মানসূর ইয়ামান থেকে হবেন এবং তিনি ইমাম মাহদীর পরিবারকে সাহায্য করবেন, আর তাই মুসলিমদেরকে তার ডাকে সারা দিতে ও তাকে সাহায্য করতে হবে এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত হয়েছে-

হারূন (রহঃ) বলেন, আমর ইবনু আবূ কায়িস পর্যায়ক্রমে মুতাররিফ ইবনু তারিফ, হাসান ও হিলাল ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নদীর পিছন দিক থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তাকে হারিস ইবনু হাররাস বলে ডাকা হবে। তার আগে জনৈক ব্যক্তি আসবেন, যার নাম হবে মানসুর। তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিজনকে (ইমাম মাহদী ও তার পরিবারকে) আশ্রয় দিবেন, যেরূপ কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্থান দিয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা, তার ডাকে সাড়া দেয়া। (আবু দাউদ ৪২৯০)

একইভাবে শুয়াইব ইবনে ছলেহ ও ইমাম মাহমুদকেও সাহায্য করা, তাদের নেতৃত্বে জামায়াতবদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। যখন তাদের আবির্ভাব হবে এবং তারা সঠিক দলিল প্রমাণ ও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঘোষণা করবে, তখন অন্য সকল দল-মত চাই তা হকের উপর বা বাতিলের উপর, সবই ত্যাগ করে তাদের আনুগত্যে আসতে হবে। এটাই প্রত্যেক মুসলিমের উপর তখন আবশ্যক। আর যদি তাদের বিরোধিতা করা হয় তাহলে ইহকালে ও পরকালে এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

বিশেষ এই বিষয়টি যেমন জামায়াত বাছাইয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার তেমনি যদি স্বাভাবিকভাবেও লক্ষ্য করি তাহলে এই জামায়াতের বৈশিষ্ট্য যেরকম কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া দরকার ঠিক সেরকমই রয়েছে। এই দলটি যে শুধু বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম করতে চায় তা নয়, এর লক্ষ্য আরো দূর সীমানা পর্যন্ত বিজয় করা এমনকি বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। তাই-

- যদি কেউ হক জামায়াত খোঁজে তার নিকট অবস্থানে, নিজের অঞ্চলের মধ্যে (বাংলাদেশ ও ভারত) তাহলে ইমাম মাহমুদের জামায়াতটিকে ছাড়া অন্য কোন জামায়াতকে খুঁজে পাবে না, যারা মিনহাজুন নুবুয়াহ এর উপর সঠিক ভাবে আছে। আর তাই সর্বপ্রথম উচিত হবে নিজ আঞ্চলিক মুসলিম জামায়াতের সাথেই যুক্ত হওয়া ও তাদের সাথে কাজ করে যাওয়া।
- এই জামায়াতটি কতটা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা বাস্তবে জানতে এতে যুক্ত থেকে এর কার্যক্রমগুলো লক্ষ্য করা।

অতঃপর যেহেতু এই দলকে দুইভাবে আমরা নির্বাচন করছি-

১. হক দলের সকল বৈশিষ্ট্য আছে তাই এবং নিজ অঞ্চলের মধ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২. এই জামাআতটি রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত করা নেতার মাধ্যমে পরিচালিত। এবং বারোজন কুরাইশ নেতার যে আগমন হওয়ার

কথা তার মধ্যে একজন। তাই অন্য সকল জামায়াত ও মতকে ত্যাগ করে এই জামাআতেই যুক্ত হওয়া আবশ্যক বিষয়। এমনকি যত বড় মুসলিম জামাআতই থাকুক তাদের জন্য আবশ্যক হবে যে তারা সকলে রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীরের আনুগত্য করবে। কারণ রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর তথা কুরাইশ থেকে আগমন করা বারো আমীরদের যে কেউ পৃথিবীতে অবস্থান করলে তাদের আনুগত্যে জামায়াতবদ্ধ হওয়া সকল মুসলিমদের দায়িত্ব। এর মূল ও অন্যতম কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাদের হাতেই মুসলিমদের বিজয় ও রাষ্ট্রক্ষমতা দিবেন। যদি তারা না থাকে তাহলে ১ নং বিষয়টি শুধু প্রযোজ্য হবে।

উপরোক্ত দুইটি কারণেই আমরা এই জামায়াতে যুক্ত হতে পারি, আর তা আমীর মাহমুদের কাছে আনুগত্যের বায়াত নিয়ে। যদিও উপরের যেকোনো একটি বিষয় যদি কোন দলের মধ্যে থাকে তাহলে তাতে যুক্ত হতে কোনই দোষ নেই বরং উচিত কাজ হবে।

অতঃপর দুইটি বিষয় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে হবে-

১. রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীরকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে জামায়াতবদ্ধ হবে।

২. রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত কিনা সে বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে জ্ঞানস্বল্পতার কারণে কিংবা অন্তরে নিফাকী থাকার কারণে।

কারণ ইতিহাসে দেখা যায় যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদের মধ্যে কাউকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন তখনই মানুষ সন্দেহ ও বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেছে। নাবী-রসূল, খলীফা বা আমীর কিংবা মুজাদ্দিদগণও এ থেকে বাঁচতে পারেন নি। ঠিক যেমন রসূল ﷺ এর জামানায় বলত মুশরিক-ইহুদিরা যে- আমাদের মধ্যে আল্লাহ কাউকে মনোনীত করে পাঠালে তাকে আমরা মেনে নিব। কিন্তু যখন পাঠিয়েছে তখন তারা সকলে অস্বীকার করে বসে। আর তার সাথে মিথ্যা অপপ্রচার, বিদ্রোহ, মুনাফিকি, শাসক ও আলেম সমাজ থেকে বিভিন্ন পথভ্রষ্ট ফতোয়া তো ছিলই। যেমনভাবে মুসলিমরাই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) কে

শাসকের কাছে তার ব্যাপারে মিথ্যা খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে জেলবন্দী করে। আর যখন সেই আয়াতের কথা কেউ উচ্চারণ করে- 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী'। তখন এদের থেকেই আবার সেই আগমন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত সাহায্যকারীকে অস্বীকার করে। তারা তাকে মেনে নেয় না বরং বিরোধিতা করে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাড়িয়ে দেয়। ইমাম মাহদীর সাথেও মুসলিমরা একই কাজ করবে যদি তার আবির্ভাব হয়। অতঃপর মুসলিমদের উপরের দুই অবস্থার মধ্যে আপনি কোন অবস্থানে আসবেন তা ঠিক করতে যে দলিল ও যাচাই-বাছাই দরকার সে বিষয়েই এখন আলোচনা হবে।

নেতার পরিচয় ও তার আকীদা-মানহাজ, মাজহাব

আমীরের নাম- জুয়েল মাহমুদ বিন আব্দুল কদীর। ঠিকানা- গ্রামঃ গাওপাড়া, পাকা ইউনিয়ন, উপজেলাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। তিনি হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এবং ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ বলেও ব্যাপক পরিচিত। তার আকীদা-মানহাজ জানার জন্য, তিনি ইসলামী শরীয়ত কতটুকু মানে, তাতে কোন শিরক-বিদআত-বক্রতা আছে কিনা, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন মত বা আদর্শ আছে কিনা তা জানার জন্য সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হচ্ছে তার নিজের লেখা প্রকাশিত বইগুলো পড়া। যেমন-

- সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
- তা'লিমুত তাওহীদ
- তাওহীদ আল ইবাদাহ

উপরোক্ত তিনটি বই পড়লে তার আকীদা ও আল্লাহ সম্পর্কে তার চিন্তা-মনোভাব, ইসলামী জীবনব্যবস্থা কোনটি তিনি গ্রহণ করেছেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে তার মনোভাব, তাওহীদ সম্পর্কে তার জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর ধারণা পাওয়া যাবে।

- ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
- ইসলাম পালনের মূলনীতি
- আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
- ইসলামে সামাজিক জীবন
- মুক্তির পয়গাম
- তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
- ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি

উপরোক্ত বইগুলো পড়লে তার ইসলাম সম্পর্কে ও ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে তার চিন্তা-মনোভাব, তার তাকওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। এতে কোন ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত কোন বিষয় আছে কিনা তা খোঁজ করার মাধ্যমে এই নেতাকে যাচাই করা যাবে।

- মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
- আল্লাহর পথের পথিক
- গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা
- তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ
- আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই

উপরোক্ত তার লেখা বইগুলো পড়লে তার জিহাদ বিষয়ে মনোভাব, তার ইসলামী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান সাথে তার জামায়াত ও জিহাদ পরিচালনার বিষয়ে দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনা স্পষ্ট ফুটে আসে। তাঁর লেখা ‘‘আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই’’ বইতে তিনি স্পষ্ট করেছেন তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তাঁর কর্মসূচি। এটি পড়ার পর তাঁর বিষয়ে ও তাঁর দল বিষয়ে আর কোন জানার বিষয় থাকে না। নারীদের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে আর তিনি কি মনোভাব রাখেন তার বিষয়ও স্পষ্ট হয় ‘‘দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা’’ বইটিতে। যেখানে বর্তমানে বিভিন্ন সুবিধাবাদী দল ইসলামী শরীয়তের বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে নারীদের বিষয়ে যে অবস্থান নিয়ে থাকে পশ্চিমা খ্রিষ্টান-ইহুদিদের চাপে, ব্যতিক্রমভাবে তার মধ্যে তিনি যে সঠিক মতাদর্শের উপরে আছেন তাও জানা যায়। অতঃপর তার জিহাদ-

হিজরত-যুদ্ধপরিকল্পনা ও ইসলামী ইমারত, খিলাফত প্রতিষ্ঠার রূপরেখার অনেকটাও এই সকল লেখা বইতে ফুটে ওঠে। বইগুলো ডাউনলোড করতে এই লিঙ্ক দেখুন-

https://dl.gazwatulhind.site/ বা https://dl.gazwatulhind.com/

অতঃপর তার বিভিন্ন বক্তৃতা-লেকচার শোনা। তাতে তিনি ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত কোন মতাদর্শ মানেন কিনা, দ্বীন ইসলাম কায়েমের ক্ষেত্রে তার পদ্ধতি, মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সঠিক আছে কিনা তার ব্যাপারে বিস্তরভাবে জানা যাবে। যা একটি দলের, একটি জামায়াতের নেতার সম্পর্কে জানতে পারলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। তার লেকচার লিঙ্ক (ইউটিউব)-

https://www.youtube.com/@ummaherbarta8875

অতঃপর তার ব্যক্তিজীবন, জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে তার পরিচয় নিয়ে দুটি ডকুমেন্টারি দেখুন। লিঙ্ক-

ইমাম মাহমুদের জীবনী - মিডিয়া ও প্রকাশনী বিভাগ থেকে প্রকাশিত
লিঙ্ক- https://www.gazwatulhind.site/docs/imam-mahmud-biography-1/

ইমাম মাহমুদের আদ্যোপান্ত এর তালাশে – প্রতিবেদন
লিঙ্ক- https://www.gazwatulhind.site/docs/imam-mahmud-documentary/

ইউটিউব ভিডিও লিঙ্ক- https://youtu.be/QkyGHrXxvEM

ফেসবুক লিঙ্ক-
https://www.facebook.com/mahmudgazwatulhind/videos/1064743138344181

তিনি দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য কাজ করার কারণে তাগুতের দ্বারা ব্যাপক জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জেলবন্দী জীবনে কাটিয়েছেন। আর এই কথা সবারই জানা যা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছিলেন-

তোমরা যদি হক আর বাতিল চিনতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকো, তাহলে বিধর্মীদের দিকে তাকাও, তারা কাদের উপর বেশি আক্রমণাত্মক ও কাদের সাথে বেশি শত্রুতা রাখে। কারণ হক বাতিল চিনতে মুসলিমরা ভুল করলেও কাফির-মুশরিকরা তা ঠিকই চিনে নেয়। তাই তাগুত সরকারগুলো শুধু এদেশে নয়, সারা বিশ্বে তাওহীদবাদী মুসলিমদের উপর জুলুম-অত্যাচার বেশি করছে, যারা দ্বীন ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তা গণতন্ত্র পন্থায় না করে কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে।

তার জামায়াত

অতঃপর এই নেতা কিভাবে জামায়াতকে পরিচালনা করেন, জামায়াতকে কিভাবে নেতৃত্ব দিয়ে দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য অগ্রগামী করছেন, কর্মীরা দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য কিভাবে কাজ করছেন তা দেখেই জামায়াতের বিষয়টি সম্পর্কে আরো ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমান বাংলাদেশে কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ পদ্ধতির উপর দ্বীন ইসলাম কায়েমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঘোষণা করে কোন জামায়াত আর নেই যা আগেই উপরে বিস্তর আলোচনা করে এসেছি। যেসকল দল জিহাদ শব্দটা বলে তারা এর অর্থ করে থাকে চেষ্টা, সংগ্রাম ও দাওয়াতের জন্য নিজের সবকিছুই উজাড় করে দেওয়া। অনেকে আন্দোলন ও মিছিল-মিটিং, মিডিয়া-লেখালেখি, বক্তৃতাকেই বুঝিয়ে থাকে যা শুধুই অপব্যাখ্যা। আর তালিবান ও আল-কায়েদার কোন শাখা এই অঞ্চলে আছে কিনা সে বিষয়েও আলোচনা করেছি।

এখন যে আলোচনা থাকে তার মধ্যে দুইটি বিষয় আসে-

১. তালিবান ও তানজীম আল-কায়েদা হক কিনা, আর হলে আবার ইমাম মাহমুদের জামায়াতের সাথে থাকলে হকের উপরেই থাকা হবে কিনা?

২. তালিবান ও তানজীম আল-কায়েদা কি কারণে বাতিল হতে পারে। যে দল দুটির বিষয়ে আগে তেমন একটা আলোচনা করা হলেও কোন উপসংহারে যাওয়া হয়নি।

উপরে একটি লেখাতে বলেছিলাম যে হক দল একাধিকও হতে পারে তবে হক একাধিক হয় না। একটিই হয়। একটি আদর্শ, একটি মতই হক হয়। তবে সেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন হক দল তথা হক জামায়াত হতে পারে। যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ, আকীদা-মাজহাব, মানহাজ একই হতে পারে। তবে তারা একত্রিত হয়ে যায় এবং কিভাবে হতে পারে সে বিষয়েও আগেই উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তাই অঞ্চলভেদে যদি কোন দল দ্বীন ইসলামের জন্য কাজ করে যায় তাতে দোষের কিছু নেই এবং হকের উপর উভয়ই থাকতে পারে। যেমন ধরি পাকিস্তানে ইসলাম কায়েম করতে চেষ্টা করছে একটি দল, তার মধ্যে হক দলের সকল বৈশিষ্ট্যই আছে। তারা আল্লাহর সাহায্যও পাচ্ছে বিজয় আনতে। আবার অন্য অঞ্চল যেমন বর্তমানে ইয়ামানে অঞ্চলভিত্তিক একটি জামায়াতের প্রকাশ ঘটে যাদের অবস্থাও হকের উপর তাহলে তারাও কাজ করে যেতে পারে আলাদা ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে। এতে হক আলাদা হয় না, একই থাকে। একইভাবে তালিবান ও আল-কায়েদাকে যদি হক মানেন তবে তাদের অঞ্চল অনুযায়ী তারা কাজ করে যাচ্ছে। আর আল-কায়েদা তালিবানের কাছেই বায়াত নেওয়া। যদিও তালিবানদের বিষয়ে দেখা যায় যে তারা যুদ্ধ ও অভিযান বন্ধ করে দেশ উন্নয়ন বিষয়েই পরে আছে। অর্থাৎ যদি হিজরত করেও সেদেশে যাওয়া হয় তাহলে সেখানে যেয়ে এখন দ্বীন কায়েমের জন্য কোন ফ্রন্টে যেতে পারবেন না। আর কোন ফ্রন্টে যদি যেতে না পারেন তাহলে বিশ্ব অবস্থা যেভাবে আছে সেভাবেই পরে থাকবে, মুসলিমরা মার খেতেই থাকবে কিন্তু জিহাদ আর চালু হবে না। বলতে গেলে আফগান এর মনোভাব এই যে- নিজেদের রাষ্ট্র ঠিক থাকুক আর যেখানে যা হওয়ার হতে থাক। এটা তো কোন সময়ই কাম্য নয়। বরং জিহাদ চলতেই থাকবে। ডিফেন্সিভভাবে চলেছে এখন আউটসাইড অ্যাটাক চলবে। কিন্তু তালিবান কি কোথাও জিহাদ চালাচ্ছে কিনা এখন বা কোথাও নির্দেশ দিয়েছে কিনা, দেখা যায় এরকম কোন বিষয় নেই। তাই ফ্রন্ট খোলা থাকে একটি আর তা হচ্ছে তানজীম আল কায়েদা। আবার এটির ফ্রন্টে যোগ দিতে দরকার হবে সুদূর হিজরত করা। তাহলে আমাদের নিজেদের ভূমি কখন বিজয় হবে? অঞ্চলভিত্তিক ভাবে

শুরু করাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আর যেহেতু বাংলাদেশে এখন অঞ্চলভিত্তিক শুধু ইমাম মাহমুদের জামায়াতটি ই কাজ করতেছে হকের উপর থেকে তাই আমাদের এই জামায়াতের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করায় কোনই বাঁধা নেই বরং তা একটি আবশ্যকীয় বিষয় হবে। তাই হক দল আরো থাকলেও এই দলটিও হক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে অঞ্চলভিত্তিক অবস্থায়। এটি হচ্ছে ১ নং বিষয়ের উত্তর। এই উত্তরটি তাদের জন্য যারা সেই সব দলকে হকের চূড়া মনে করে থাকে।

অতঃপর, ২ নং বিষয়টি হচ্ছে তালিবান ও আল-কায়েদা বাতিল কিনা। একটু আগেই উপরে বর্ণনা করেছি যে তালিবান এখন কোন জিহাদের ফ্রন্ট পরিচালনা করছে না, তাদের অঞ্চল নিয়েই তারা বসে আছে। তাই একটি ফ্রন্টই খোলা। সে বিষয়েও আলোচনা কিছুটা উপরে করলাম। এখন, একটি বিষয় আমি আগেই উল্লেখ করেছিলাম এই দল সম্পর্কে আর তা হচ্ছে ইমাম মাহমুদ এর জামায়াত তথা কাফেলা এর নেতার বিষয়ে। যিনি রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত বারো আমীরের একজন নেতা। একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে এরকম আমীরদের আবির্ভাব হয়ই যখন অন্য দল, জামায়াতের মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা থাকে, সঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে না কিংবা তাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সেই বিজয় অর্জন সম্ভব নয় যা রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীরের মাধ্যমে হবে ও হওয়ার বিষয়ে যেভাবে বলা আছে, ঘোষণা আগে থেকেই দেওয়া আছে। এ থেকেই অন্য দল বিষয়ে অনুমান করা যায় যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ হক রাখবেন নাকি উঠিয়ে নিবেন। কিভাবে হক থেকে সরে যেতে পারে তার উদাহরণও আগে দেওয়া হয়েছে। যেমন- দুইটি হক দল, যাদের উপর আল্লাহর সাহায্য আছে এবং তারা বিজয়ীও হচ্ছে। এখন এই দল দুটি যখন একত্র হয় তখন যদি কোন দলের আমীর রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর হয় তাহলে তাকে মান্য করতে হবে। কিন্তু যদি না করে তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ হকের উপর থেকে সরে বাতিলের কাতারে চলে যাবে, বিদ্রোহী হিসেবে। তাদের উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য উঠে যাবে ও আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে। উদাহরণ হিসেবে যেমন আল-কায়েদার শাখা অংশ ছিল আইএস, তারা আল্লাহর

সাহায্যে অনেক অঞ্চল বিজয় করেছিল। কিন্তু যখন আল-কায়েদার আমীরের সাথে বিদ্রোহ করলো, তৎক্ষণাৎই তারা হক থেকে সরে বাতিলের কাতারে চলে গেল এবং পরে দ্রুতই তাদের ধ্বংস হয়ে গেল।

আর যেখানে ইমাম মাহমুদ মুসলিমদের একত্রিত করে জামায়াতবদ্ধ করতেছেন ইমাম মাহদীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে তখন অন্য যেকোনো হক দলেরই উচিত হবে তার আনুগত্য মেনে নেওয়া। না মানলে তারা আর হক থাকবে না। তাই হিন্দ অঞ্চলের জন্য ইমাম মাহমুদকে মেনে নেওয়া এবং ইয়ামান অঞ্চলে যদি এরকম বিভিন্ন দল থাকে, তা আল-কায়েদাই হোক তাও সেখানের আঞ্চলিক রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর মানসূরকে মেনে নেওয়া আবশ্যক। একইভাবে শুয়াইব ইবনে ছলেহ এর কাছেও তাঁর অঞ্চল ভিত্তিক সকল দল-উপদলকে আনুগত্যের শপথ নিতে হবে।

অতঃপর, তালিবান ও আল-কায়েদার বিষয়টি যেটিই হোক, তাওহীদবাদী লোকজন যেভাবেই তাদের মূল্যায়ন করুক, তাদের সেই মনোভাবে কোন আঘাত না দিয়ে বলতে চাই- তাও ইমাম মাহমুদের আনুগত্যে যেতে, তাঁর নেতৃত্বে হিজরত-জিহাদ করতে কোন বাঁধা নেই। যদিও তালিবান এর বিভিন্ন পদস্থলন আছে। তারা নিজেদের অঞ্চল বিজয় করে নতুন অঞ্চল বিজয়ের জন্য ছুটছে না যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে মাজলুমরা ডাকছে। তাদের মধ্যে এখনও মাজহাবীয় গোড়ামি রয়েছে; ক্ষমতায় যাওয়ার কিছু সময় পরেই তারা সালাফী মানহাজের লোকদেরকে ধর্মত্যাগ এর মত বিষয়ের সাথে তুলনা করেছে। যেমন আইন করা হয়েছে-

''ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ৬০ পৃষ্ঠার ফৌজদারি আইনে হানাফি মাযহাব ত্যাগ করলে অথবা হানাফি মাযহাব ত্যাগের জন্য কুমন্ত্রণা দিলে তাকে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে। নথির মূল পাঠে বলা হয়েছে-

হানাফি মাযহাবের বিরোধিতাকারীদের জন্য তা'যির (দণ্ড) ছাব্বিশতম অনুচ্ছেদ: আফগানিস্তানে হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের এই মাযহাব ত্যাগ করার অনুমতি নেই। যদি বিচারকের কাছে এটি প্রমাণিত হয়, তবে মাযহাব ত্যাগকারীকে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।''

এখন একটু ভেবে দেখুন এত দিন আলেমরা বলে আসতো যেকোনো মাজহাব মানার বিষয়ে, সাথে বলতো অন্য মাজহাব যেমন মালেকি, হাম্বলি, শাফেই এগুলোও ঠিক। তাহলে এখন এই অবস্থার ক্ষেত্রে এদেশের তালিবান অনুসারীরা কি বলবে? যদিও যাদের নামে এসব মাজহাব তারা নিজেরাও এগুলো তৈরি করে যায় নি বা তৈরি করতে বলেও যায় নি। এখানে শুধু একটি উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে আফগানের বর্তমান শাসন বিষয়ে। এখন একটু চিন্তা করুন যখন ইমাম মাহদীর দল প্রস্তুত হবে তখন কি তারা এরকম হানাফী মাজহাব নিয়ে থাকবে নাকি সঠিক দলিলসম্মত সুন্নাহ এর দিকে ফিরবে? যারা আফগান বিজয়ে সাহায্য করলো, ঐ সকল সালাফী বা অন্য মাজহাবের কি হবে? তারা কি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না? তারা যেখানে বৃহৎ স্বার্থে এসকল দ্বন্দ্বে ছাড় দিয়ে গেছে, আজকে সেই লাভবান জাতি এ বিষয়ে কোন ছাড় দিতে রাজি নয়। আর এমন বিষয় যা নিশ্চিত গোমরাহীর দিকেও নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া তাদের আকিদা-তাওহীদের ক্ষেত্রেও বিচ্যুতি আছে, বলা যায়- এসকল কারণে আল্লাহ এই পূর্ব অঞ্চলে রসূল ﷺ কর্তৃক ঘোষণাকৃত একজন আমীরকে পাঠিয়েছেন মুসলিমদের একত্রিত করে জামায়াতবদ্ধ করতে এবং কিতালের পদ্ধতিতে এই পূর্ব অঞ্চল সম্পূর্ণ বিজয় করে ইমারত গঠনে; আর তা অবশ্যই কোন মাজহাবের অনুকূলে গিয়ে নয় যেখানে হাদিস দেখালে উত্তরে অমুক ইমাম এটি বলেছে বলে তা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় বরং তা হবে সঠিক কুরআন-সুন্নাহ এর দলিল মোতাবেক। এবং তাকে পাঠিয়েছেন ইমাম মাহদীর অগ্রগামী বাহিনীর নেতা হিসেবে যিনি হিন্দ বিজয় করে আরবে যেয়ে ইমাম মাহদীর কাছে আনুগত্যের বায়াত নিয়ে তার হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দিবেন। ইমাম মাহমুদ নিজে ইমারত গঠন করে খিলাফতের ঘোষণা দিবেন না।

আবার যদি হাদিস দেখি বৃহত্তর খুরাসান অঞ্চল (কাজাখিস্তান, তাজিকিস্তান, ইরানের-আফগানের কিছু অংশও) থেকে আবির্ভাব হবেন শুয়াইব ইবনে ছলেহ। তিনি তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে মুসলিমদের বিজয় আনবেন। তিনি হবেন অল্প বয়স্ক, কোন বৃদ্ধ নন। তিনি ইমাম মাহদীর অগ্রগামী বাহিনীর একজন নেতা হবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ে

ভূমিকা রাখবেন এবং ইমাম মাহদীর কাছে বিজয় করা ভূমির দায়িত্ব ছেড়ে দিবেন ও তার আনুগত্যের শপথ নিবেন, যা হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান খুরাসান ও আফগানের তালিবান শাসন দেখলে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটিও একটি প্রমাণ যে আল্লাহ তাদের হাতে সেই বড় বিজয় দিবেন না। যখন শুয়াইব ইবনে ছলেহ এর আত্মপ্রকাশ হবে (যা খুব দ্রততম সময়ের মধ্যেই) তখন তিনি বাহিনী নেতৃত্ব দিবেন ও সে অঞ্চল বিজয় করবেন, নেতৃত্বে আনবেন।

এবং রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত ইমাম মাহমুদের কাছেই একইভাবে আল্লাহ মুসলিম জামায়াতকে একত্রিত করে তাদের মাধ্যমে মুসলিমদের বিজয় দিবেন। অন্য কেউ হক থাকুক বা বাতিল থাকুক তাদের মাধ্যমে দিবেন না। যতক্ষণ না এরকম কোন আমীরের আবির্ভাব হয় ততক্ষণ সেই অঞ্চলে অন্য জামায়াতগুলো হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে উপরে বর্ণনা করা শর্তগুলো মেনে। এবং যদি এরকম আমীরের আবির্ভাব হয়, তাহলে তার আনুগত্যে যেয়েই সেই হকের উপর টিকে থাকতে পারবে। এছাড়া অস্বীকার করার পরিণাম হবে বাতিলের কাতারে যাওয়া।

সর্বশেষ যে বিষয় থাকে-

> যদিও হক দলের সকল বৈশিষ্ট্য ইমাম মাহমুদের নেতৃত্বে পরিচালিত দলের মধ্যে আছে আর এটা হক দল আমরা মানি এর কার্যক্রম দেখে ও নেতার পরিচয়, আদর্শ, আকীদা জেনে। যা এই জামায়াতের সাথে যুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট হয়, আর অঞ্চলভিত্তিক তার সমকক্ষ কোন হক জামায়াতও আর নেই। তবে ইমাম মাহমুদ কি আসলেই রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত কোন আমীর কিনা? এর ব্যাপারে কি দলিল-প্রমাণ আছে যা বিশেষ করে এই বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসকে মজবুত করবে?

সর্বশেষ এই বিষয়টি থাকে যাতে আমীরের সম্পর্কে এ বিষয়ে জেনে তার আনুগত্য সেইভাবে করা যায়। আর যখন এটা স্পষ্টভাবে জানা যাবে দলিল-প্রমানের ভিত্তিতে যে তিনিই মনোনীত আমীর তখন তার মাধ্যমেই যে আল্লাহ বিজয় দিবেন, অন্য কোন দলের মাধ্যমে যে আল্লাহ বিজয় দিবেন

না; যারা তাকে মানবে না, হক দল হোক বা বাতিল হোক, তারা তখন সকলেই বাতিলের কাতারে চলে যাবে এবং তার মতাদর্শই যে সঠিক, অন্যগুলো বাতিল সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা চলে আসবে। আর এটাও দেখা যাবে যে তার কার্যক্রমগুলোতে কুরআন-সুন্নাহর সাথে সব থেকে বেশি মিল রয়েছে।

রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর হওয়ার দলিল-প্রমাণ

রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর বলতে বুঝায় রসূল ﷺ যাদের ব্যাপারে বলে গেছেন কিংবা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, যাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ একত্রিত হবে এবং শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হচ্ছে রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর বারো কুরাইশী খলীফাগণের আগমন হওয়ার বিষয়ে। হাদিস-

আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... জাবির ইবন সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার পর বার জন আমীর হবেন। জাবির (রা:) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি, তাই আমার কাছে যে ব্যক্তি ছিলেন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, তারা প্রত্যেকেই কুরায়শ গোত্রভুক্ত হবেন।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৩ [ইঃ ফাঃ ২২২৬]; সহিহাহ ১০৭৫; বুখারী ১০৭৫)

হযরত জাবের বিন সামুরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি যে, এই দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তোমাদের মাঝে ১২ জন খলীফাহ না আসে। তারা সবাই তাদের প্রত্যেক উম্মতকে নিজের নিকট একত্রিত করবে। সাহাবী বলেন, তারপর রসূল ﷺ একটি কথা বললেন, তা আমি বুঝতে পারিনাই। আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম রসূল ﷺ কি বলেছেন? পিতা বললেন, তিনি বলেছেন, খলিফাহ সকলেই কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ ৪৫৫৪, ৪৫৫৭, ৪৫৫৮, ৪৫৫৯; আবু দাউদ ৪৯৭৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৩০])

অনেকেই বলে থাকে এই বারো আমীরের বিষয় টা শিয়াদের বিষয়। তবে যারা বলে থাকে তারা যদি হাদিসগুলো দেখে, দেখবে যে কুতুবে সিত্তাহ এর ৬ টি গ্রন্থের ৫ টি গ্রন্থেই এই হাদিসগুলো আছে, তাও অসংখ্য। আর

তারা শিয়াদের সাথে এ বিষয়ে মূল পার্থক্য কোথায় সেটাও জানে না। আর সেটি হচ্ছে- শিয়ারা মনে করে এই বারো ইমাম আহলে বাইত তথা রসূল ﷺ এর বংশধর থেকেই হবে, কিন্তু হাদিসের প্রকৃত অর্থ দেখলে বুঝা যায়, এই বারো জন আমীর তথা ইমাম বা খলীফা আসবেন কুরাইশ থেকে। কুরাইশ আর আহলে বাইত একই বিষয় নয়। সাথে শিয়ারা কিছু ব্যক্তিকে তাদের মত করে এই ইমাম বানিয়ে নিয়েছে, সেটাও একটা বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

অতঃপর, এই বারো খলীফার অনেকের ব্যাপারেই হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। কারো বিষয়ে শুধু ইঙ্গিত রয়েছে। এই বারোজন আমীর তথা খলীফার মধ্যে প্রথম ৪ খলীফা এবং উমার ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) সহ ৫ জনের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণ একমত। অতঃপর শেষ জামানায় আবির্ভাব হবে তাদের মধ্যে পাওয়া যায় ইমাম মাহদী, ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসূর, ইমাম জাহজাহ। আর বারো জন কুরাইশি আমীরের পর সর্বশেষ ঈসা আঃ এর আগমন হবে। যাদের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আমরা ইমাম মাহমুদ বিষয়েই আলোচনা করছি তাই শুধু তার বিষয়ের দলিলগুলো আনছি। যার মধ্যে আবু দাউদ এর হাদিসটি বেশ শক্তিশালী-

হযরত উমায়ের বিন হানি আল-আনাসি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি ফিতনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। এমন কি ফিতনায়ে আহলাসেরও উল্লেখ করলেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আহলাস ফিতনা কি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পলায়ন ও লুটতরাজ। অতঃপর দেখা দিবে ফিতনাতুস সাররা (ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে ফিতনা)। উক্ত ফিতনার ধোঁয়া আমার পরিবারস্থ এক ব্যাক্তির দু'পায়ের নীচ থেকে উৎপত্তি লাভ করবে। সে ধারণা করবে যে, সে আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অথচ সে আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ আমার বন্ধু হচ্ছে আল্লাহ ভীরু ব্যক্তিগণ। অতঃপর লোকেরা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এমন একজন ব্যক্তির কাছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে, কেমন যেন সে পাজঁরের হাড়ের উপর নিতম্বের হাড় সদৃশ দুর্বল ব্যক্তি। (অপর অনুবাদে এসেছে- দুর্বলচিত্ত ও ল্যাংড়া)

তারপর শুরু হবে 'দুহায়মা ফিতনা' বা ঘন অন্ধকারময় ফিতনা। সেই ফিতনা এই উম্মতের কোন লোককেই একটি চপোটাঘাত না করে ছাড়বে না। আর যখন বলা হবে

ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে এ সময়ে যে লোকটি সকালে মুমিন ছিল সন্ধ্যায় সে কাফির হয়ে যাবে। পরিশেষে সকল মানুষ দুটি তাবুতে (শিবিরে) বিভক্ত হয়ে যাবে একটি হবে ঈমানের শিবির, যেখানে মুনাফিকী থাকবে না। আর একটি হবে মুনাফেকীর শিবির, যেখানে ঈমান থাকবে না। যখন তোমাদের এ অবস্থা হবে, তখন দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা করবে ঐ দিন বা তার পরের দিন থেকে।

- সহিহ, সুনান আবু দাউদ আলবানী একাঃ ৪২৪৩ [ইসঃ ফাঃ ৪১৯৫]; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; আহমাদ ৬১৬৮; হিলিয়াতুল আউলিয়া ৫/১৫৮; মিশকাত ৫২৯৩; মুসতাদরাকে হাকিম ৮৪৪১)

এই হাদিস টার ব্যাখ্যা আযিফাতিল আযিফাহ (কিয়মত সন্নিকটে) গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করলাম-

ব্যাখ্যাঃ كورك على ضلع দিয়ে একটি শাব্দিক ব্যাখ্যা বুঝায়- على ضلع পাজরের উপরে অর্থাৎ বুকের দুইপাশের পাজরের উপরে দুই বাহুকে বুঝানো হয়েছে এর অর্থ হলো দুই হাতের বাহুতে এক ধরণের দুর্বলতা হবে, আর তা কেমন হতে পারে এটা বুঝানোর জন্য كورك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা উরুর হাড়ের মত হবে। অর্থাৎ, উরুর যে লম্বালম্বি হাড় নিতম্ব পর্যন্ত চলে এসেছে সেই হাড়ের মত হয়ে যাবে বাহ্যিক অবস্থার ধরনের দিক দিয়ে। যা সাধারণত দুই হাতকে যেভাবে মানুষ তার ডান হাত ডান পার্শে এবং বাম হাত বাম পার্শে সোজা বরাবর উপরের দিকে উঠাতে পারে, কিন্তু সেভাবে সাধারণত উরুর দুই পা উপরের দিকে উঠে আসেনা। উপরের দিকে নিয়ে আসতে চাইলেও অনেক কষ্ট করতে হয়, আর অধিকাংশ লোকদের পক্ষে তেমনটি করা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনিভাবে সেই ব্যক্তির পাজরের উপরের দুই বাহু উরুর হাড়ের ন্যায় হয়ে যাবে অসুস্থজনিত কারণে, যা সে সাধারণভাবে তার দুই হাতকে বাহুসহ উপরের দিকে উঠাতে পারবেন না আর এটা তার এক ধরনের দুর্বলতা হবে, আর এটাকেই হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে كورك উরুর হাড়ের ন্যায়। তাহলে كورك على ضلع এর একটি অর্থ হচ্ছে- পাজরের উপরে দুই বাহুতে দুর্বলতার কারণে তিনি তেমন শক্তি পাবেন না। তবে তার দুই বাহুসহ হাত সর্বদা নিচের দিকেই রাখতে পারবে স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু তা উরুর হাড়ের ন্যায় উপরের দিকে নিয়ে আসতে কষ্টকর হয়ে যাবে। অর্থ্যাৎ পাজরের উপরে তথা দুইবাহুতে স্বাভাবিক ভাবে উরুর হাড়ের মত হবে উপরের দিকে উঠাতে না পারার দিক দিয়ে, এমন দুর্বল ব্যক্তির নিকটে লোকেরা দ্বীন কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তখন ইবারতের শাব্দিক অর্থ হয় - লোকেরা দ্বীন কায়েমের জন্য এমন এক ব্যক্তির নিকট ঐক্যবদ্ধ হবে যার 'পাজরের হাড়ের উপরে দুর্বলতার কারনে হবে উরুর হাড়ের মত' (সাদৃশ্য)।

উপরের ব্যাখ্যাটি كورك তথা উরুর হাড়ের মত অর্থাৎ ك হুরুফে জার ও ورك মাজরুর হিসেবে ধরে শাব্দিক অর্থ হয়। যদি ك হুরুফে জার ورك على ضلع এর মাজরুর হয়, তাহলে অর্থ হয়- ''পাজরের উপর নিতম্বের'' মত বা কেমন যেন ''পাজরের উপর নিতম্ব''। অর্থাৎ 'নিতম্ব বা কোমরের নিচে পাজরের হাড়ের' মত। এই শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি হয়- ''কোমরের নিচে পাজরের হাড়'', যেখানে উরুর মজবুত হাড়ের উপর কোমর বা নিতম্ব হওয়ার কথা একজন স্বাভাবিক গঠনের মানুষের। কিন্তু যদি কোমর বা নিতম্বের নিচে উরুর মজবুত হাড়ের বদলে পাজরের হাড়ের মত থাকে তাহলে সেই হাড় সেই মানুষের শরীরের ওজন বহন করতে পারে না। নিতম্ব বা কোমর এবং শরীরের উপরের অংশ খুবই নড়বড়ে থাকে এবং এ কারণে ঠিকভাবে চলাফেরা করা যায় না এবং তাকে দুর্বল হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই শাব্দিক ব্যাখ্যারই সাহিত্যিক ব্যাখ্যা করেছেন অনেক অনুবাদক যে ''দুর্বলচিত্ত ও ল্যাংড়া''। কারণ যার কোমর বা নিতম্বের নিচ অংশ পাজরের হাড়ের মত দুর্বল অথবা চিকন অথবা কিছুটা বাকা হাড়ের উপর স্থাপিত তিনি কোনভাবেই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবেন না। এবং তাঁর শরীরের ভার ধরে রাখতে পারবেন না। এদিক দিয়ে এটি কোমরের তথা নিতম্বের নিচ থেকে উরুর/পায়ের দুর্বলতা বুঝায়। আর পায়ের দুর্বলতাকেই অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার গ্রহণ করেছেন এবং এ কারণেই অনেক অনুবাদক এই শব্দের সাহিত্যিক অনুবাদ করেছেন ''দুর্বলচিত্ত ও ল্যাংড়া''। তাহলে كورك على ضلع এর অর্থ হচ্ছে কেমন যেন সে/তাঁর পাজরের উপর নিতম্ব। অর্থাৎ নিতম্ব বা কোমরের নিচ অংশ পাজরের (হাড়ের) মত দুর্বল হবে। কিছু ব্যাখ্যাকার এই শব্দকে সেই ব্যক্তির শারীরিক গঠন হিসেবে না ধরে উপমা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা এই শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে এই লোকটি অযোগ্য হবেন কিংবা নেতা হওয়ার যোগ্য হবে না। এই ব্যাখ্যা করার কারণ- তারা এই ব্যাখ্যা করেছেন শারীরিক বিষয়কে উহ্য করে। তারা স্বাভাবিক গঠনের মানুষের উপর এই শব্দের প্রয়োগ করে বলেছেন যেহেতু উরুর হাড়ের বদলে পাজরের হাড়ের উপর নিতম্ব বা কোমরের মত ওজনদার কিছু বসানো থাকলে তা যেমন স্বাভাবিক ভাবে বহন করা সম্ভব না, তাই সেই লোকও সেই দল বা জামায়াত কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার মত ভার/ওজন বহন করতে পারবে না। অর্থাৎ তিনি সেই সকল লোকের আমীর হওয়ার অযোগ্য হবেন। এই ব্যাখ্যাটি সাধারণ গঠনের মানুষের (যার কোন শারীরিক সমস্যা নেই তাঁর) উপর প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে তাঁর উপর রূপক অর্থ / উপমা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু হাদিসের বাস্তবায়নের সময় এই শব্দের শাব্দিক অর্থের উপর এরকম ব্যক্তিও মাওজুদ থাকতে পারে যার নিকট মুসলিমরা জামায়াতবদ্ধ হবে। যেমন- এমন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব যার শারীরিক অবস্থা আসলেই হাদিসের এই শাব্দিক অর্থের সাথে হুবহু মিলে যায় যেমন তাঁর শরীরের কোমর বা নিতম্বের নিচ অংশ পাজরের মত দুর্বল যা তাঁর ভার নিতে পারে না, এর ফলে সে স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে পারে না। আবার এই শব্দের

প্রথম ব্যাখ্যা হিসেবে তাঁর পাজরের উপরের অংশের অবস্থা যদি উরুর হাড়ের মত হয় যেমনটি উপরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাহলে স্বাভাবিক গঠনের মানুষের উপর প্রয়োগ করা সেই ইজতিহাদি উপমাস্বরূপ ব্যাখ্যা বাতিল হয়ে যাবে। তখন এই ব্যাখ্যা আর ধর্তব্য হবে না। কারণ হাদিসের শব্দের সাথেই সেই ব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তখন আর উপমা কিংবা ধারণা ভিত্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় না (আল্লাহু আলীম)।

এই হাদিসের كورك على ضلع শব্দের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহঃ) কিংবা অন্য কোন ব্যাখ্যাকারকই উক্ত ব্যক্তির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর আমীর হওয়ার যোগ্য কিংবা অযোগ্য নির্ধারণ করেন নি। বরং একজন স্বাভাবিক আকৃতির ব্যক্তির উপর এই শব্দকে উপমা স্বরূপ ধরে নিতম্ব বা কোমরকে 'ক্ষমতা বা পরিচালনা করার গুন'কে বুঝিয়েছে আর পাজর বা পাজরের হাড় দিয়ে 'দুর্বল অবস্থা'কে বুঝিয়েছে। অর্থাৎ "মুসলিমদের জামায়াত পরিচালনার জন্য দুর্বল বা অযোগ্য হবেন" এই উপমা নিয়েছেন। কিন্তু শারীরিক বৈশিষ্ট্য যদি শাব্দিক অর্থের মতই হয় যেমন ব্যক্তিটি শারীরিকভাবেই দুর্বল কিংবা হাদিসের كورك على ضلع শব্দের সাথে শারীরিক বৈশিষ্ট্য হুবহু মিলে যায় তাহলে এখানে তাঁর আর আমীর হওয়ার যোগ্য কিংবা অযোগ্য ব্যাখ্যার স্থানই থাকে না; হুবহু বৈশিষ্ট্য মিলে গেলে আর উপমা ব্যাখ্যা দরকার হয় না। এটাই ব্যাখ্যাকারকদের ব্যাখ্যার মর্মার্থ।

আর যদি কেউ মনে করে যে- কোন ব্যক্তি শারীরিকভাবে দুর্বলচিত্ত কিংবা ল্যাংড়া হলে সে আমীর হওয়ার অযোগ্য হয়ে যায় তাহলে তা হবে কুরআন-হাদিস বিরোধী কথা। আর কোন মুহাদ্দিস, ফকিহ কিংবা ব্যাখ্যাকারকও এই কথা বা শর্ত আরোপ করেন নি। শারীরিকভাবে দুর্বল কিংবা ত্রুটিপূর্ণ থাকলেও সে আমীর হওয়ার যোগ্য হবে। হাদিসে রয়েছে-

"উম্মুল হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ নাক-কান কর্তিত কোন কাফ্রী (হাবশী কালো) ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয় তবুও তোমরা তার নির্দেশ শোনো ও আনুগত্য করো, যতক্ষণ সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী পরিচালনা করে"। (সহিহ, মুসলিম ১২৯৮, ১৮৩৮; তিরমিযী ১৭০৬; নাসায়ী ৪১৯২; আহমাদ ১৬২১০, ২৬৭১৫, ২৬৭২৩; বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩৩০; আয-যিলাল ১০৬২, ১০৬৩)

"আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করো এবং আনুগত্য করো, এমনকি আংগুর ফল সদৃশ (ক্ষুদ্র; যেমন কিসমিস) মস্তিস্কবিশিষ্ট কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয়"। (সহিহ, সহীহুল বুখারী ৬৩৯; সুনান ইবনু মাজাহ ২৮৬০; আহমাদ ১১৭১৬; বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৮৭)

এখন যদি ইমাম মাহমুদকে দেখা হয় তাহলে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এই হাদিসের মিল পাওয়া যায় হুবহু। ইমাম মাহমুদ এর এই শারীরিক

অবস্থার ব্যাপারে তার পরিচিতি বিষয়ক ডকুমেন্টারিতে দেওয়া আছে যা উপরে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিসে আরো এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَكُونُ مَلْحَمَةُ عَرَقِ الدَّمِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْخَلِيْفَةِ وَيَحْضُرُ الْمَهْدِي فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ، يَجْعَلُهُ اللهُ خَلِيْفَةً لِأُمَّتِيْ فَيَأْتِي مَلَكُ اللَّهِ جِبْرِيلُ بِخَبَرٍ عِنْدَهُ لَقَدْ حَانَ الْوَقْتُ لِإِظْهَارِ الْحَقِيقَةِ وَإِزَالَةِ الْبَاطِلَةِ فَيَحْرُبُ الْمَهْدِيُّ بِجَيْشِهِ، أَعْدَادُ عُضْوِهِمْ كَأَعْدَادِ بَدْرٍ، وَهُمْ يَتَقَدَّمُونَ بِالرَّايَاتِ السَّوداءِ مِنْ قِبَلِ الشَّرْقِيَّةِ إِلَى مَكَّةَ، فِيهَا الرَّايَةُ السُّودُ الْغَالِبُ عَلَى الْهِنْدِ وَالرَّايَةُ السُّودُ الْغَالِبُ عَلَى الْخُرَاسَانِ وَالرَّايَةُ السُّودُ الْيَمَانِيُّ ثُمَّ يَفْتَحُ الْمَهْدِيُّ المكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى وَيَتَقَرَّبُ إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى يَبْكِيَ احْتِضَانَ الْكَعْبَةِ، فَيَأْتِي النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ عِنْدَهُ لِأَنْ يُبَايِعَ فَيَبِيعُ النَّاسَ مِنَ الْمَكَّةِ وَهُوَ كَارِهٌ.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: খলিফার সন্তানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হবে, এবং সেই সময়ে মাহদী উপস্থিত থাকবেন। আল্লাহ তাকে আমার উম্মতের জন্য খলিফা বানাবেন। তখন আল্লাহর ফেরেশতা জিবরীল তার কাছে এই খবর নিয়ে আসবেন যে, 'সত্যকে প্রকাশ এবং বাতিলকে দূর করার সময় হয়েছে'। তখন মাহদী তার সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করবেন, যাদের সদস্য সংখ্যা বদরের যোদ্ধাদের সমান হবে। তারা পূর্বাঞ্চল থেকে কালো পতাকা নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হবে। তার মধ্যে থাকবে হিন্দ বিজয়ী কালো পতাকা, খোরাসানের ওপর বিজয়ী কালো পতাকা এবং ইয়ামানীর কালো পতাকা। অতঃপর মাহদী মক্কাকে পুনরায় বিজয় করবেন এবং কাবার কাছাকাছি যাবেন, এমনকি তিনি কাবা শরীফকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন। সেই সময়ে লোকেরা তার নিকট বাইয়াতের জন্য আসবেন, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাদের বাইয়াত নিবেন। (কিতাবু উলূমিদ্দিন, ইমাম মুনজিরি রহ, হাঃ ৩১; আযিফাতিল আযিফাহ, খতীব বাগদাদী, হাঃ ২৮১)

وَعَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْمَدِينَةِ وَفِيهَا يُقْتَلُ شَابٌّ، ثُمَّ يَعْرِفُهُ كُلُّ بَعْدَهُ نَفْسُ الزَّكِيَّةِ وَهُوَ يُقْتَلُ بِجَيْشِ السُّفْيَانِيِّ، الَّذِينَ هُمْ جَيْشُ الطَّالِبِينَ الذَّاهِبِينَ إِلَى أَنْ يَقْتُلُوا الْمَهْدِيَّ، فَيَبْلُغُ خَبَرُ قَتْلِهِ إِلَى الْمَهْدِيِّ فَيَقُولُ وَاللَّهِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جَاءَتْ نَبَأُ السَّمَاءِ وَاقْتَرَبَ الْعَدُوُّ، صَارَ وَقْتُ الْخُرُوجِ الصِّدْقَ الْخَفِيَّ، يَا مُبَيضُ اسْتَعِدَّ مَعِي، أَنْ تَعِيدَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَتَتْرُكَ الْمَدِينَةَ، وَيْلٌ لَهُمْ يَقْتُلُونَ كَمْ مِنْ نَفْسٍ؟ يَا وَيْلَهُمْ كَمْ مِنْ نَاسٍ يَقْتُلُونَ؟ ثُمَّ يَذْهَبُ مَعَهُ بِمُبِيْضٍ أَنْ يَهْرُبَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَيَعُودُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مَكَّةَ بِنَصْرِ الْمَنْصُورِ الْيَمَانِيِّ، ثُمَّ حَتَّى يَكِيدُ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْمَهْدِيُّ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ، فَيَبْلُغُ جَيْشُ الرَّايَاتِ السُّودَاءِ مِنْ قِبَلِ الشَّرْقِيَّةِ إِلَى الْمَهْدِيِّ، أَعْدَادُهُمْ كَأَعْدَادِ غَزْوَةِ الْبَدْرِ، كُلُّهُمْ الْمُجَاهِدُونَ الْغَالِبُونَ مِنْ قَبْلُ وَأَمِيْرُهُمْ غَالِبُ الْهِنْدِ، رَجُلٌ ضَعِيفٌ قَلِيلُ الْقُوَّةِ عَلَى الْوَرْكِ

وَالْوَسَطِ، يُبَايِعُونَ عَلَى يَدِ خَلِيفَةِ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ، ثُمَّ تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْخَلِيفَةِ لِكَنْزِ الْمَالِ فِي مَكَّةَ، فَيَجِدُ الْمَهْدِيُّ أَمْرَ اللَّهِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ بِجَيْشِهِ، وَيُقَاتِلُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا قَبْلَ هَذَا قَوْمًا، فَيَغْلِبُ جَيْشُ الْمَهْدِيِّ، ثُمَّ حَتَّى يَبْكِيَ احْتِضَانَ بِالْكَعْبَةِ مُوَجِّهًا إِلَى السَّمَاءِ فَكُلٌّ يَتَنَاجُوْنَ الْقَوْلَ عَنْ غَلَبِهِ الْحَرْبِ فَهُمْ يَأْتُونَ إِلَى الْمَهْدِيِّ وَيَخْشَوْنَهُ إِلَى أَنْ يَرُواهُ فَيَبْكِي اِحْتِضَانَ بِالْكَعْبَةِ فَيَقُولُ النَّاسُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ تَعَالْ إِلَيْنَا! نَحْنُ نُبَايِعُ يَدَكَ فَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ وَيْلَكُمْ! أَتَنْقُضُونَ كَمْ مِنْ عَهْدٍ؟ وَتَسْفِكُونَ كَمْ مِنْ دَمٍ؟ وَتَخَانُونَ كَمْ مِنْ أَمَانَةٍ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَى عَرْضِهِمْ وَحَتَّى يَأْخُذَ بَيْعَةِ النَّاسِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ كَارِهٌ.

কাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: মদীনায় একটি ফিতনা সৃষ্টি হবে এবং সেখানে একজন যুবককে হত্যা করা হবে। পরবর্তীতে সবাই যাকে 'নফসে যাকিয়্যাহ' বা 'পবিত্র আত্মা' নামে চিনবে। তাকে সুফিয়ানির বাহিনী হত্যা করবে, যারা মাহদীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেখানে যাবে। তার হত্যার খবর মাহদীর কাছে পৌঁছালে তিনি বলবেন, 'আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আসমানের বার্তা এসে গেছে, এবং শত্রু নিকটবর্তী। এখন সত্যিকারার্থে গোপনে বের হওয়ার সময় হয়েছে। হে মুবাইয়িদ! আমার সাথে প্রস্তুত হও, যেন আমরা আল্লাহর ঘরে (মক্কায়) ফিরে যেতে পারি এবং মদীনা ত্যাগ করতে পারি। তাদের জন্য দুর্ভোগ! তারা কত প্রাণ হত্যা করবে? তাদের জন্য দুর্ভাগ্য! তারা কত মানুষকে হত্যা করবে? এরপর তিনি মানসুর ইয়েমেনীর সাহায্যে মুবাইয়িদকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে পালিয়ে আল্লাহর ঘর মক্কায় ফিরে যাবেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকবে যতক্ষণ না মাহদী আল্লাহর ঘর থেকে আবির্ভূত হন। তখন পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাবাহী একটি বাহিনী মাহদীর কাছে পৌঁছবে। তাদের সংখ্যা হবে বদরের যোদ্ধাদের সমান। তারা সবাই পুর্বের বিজয়ী মুজাহিদ হবে এবং তাদের আমির হবেন 'হিন্দ বিজয়ী' যিনি হবেন কোমরের মাঝে কম শক্তি সম্পন্ন। তারা আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিবেন। এরপর মক্কায় গচ্ছিত রাখা ধন-সম্পদ নিয়ে খলীফার সন্তানদের মধ্যে একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। মাহদী আল্লাহর হুকুম পেয়ে তার বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এবং তারা এমনভাবে যুদ্ধ করবে যেমনটি ইতিপূর্বে কার সাথে করেনি। মাহদীর বাহিনী বিজয়ী হবে। এরপর তিনি কাবাকে আলিঙ্গন করে আসমানের দিকে মুখ করে কাঁদবেন, আর সবাই তার যুদ্ধজয়ের কথা বলাবলি করবে। লোকজন মাহদীর কাছে আসবে এবং তাঁকে দেখে ভয় পাবে। যখন তাঁকে কাবাকে জড়িয়ে কাঁদতে দেখবে, তখন লোকেরা বলবে: হে আল্লাহর খলীফা মাহদী! আমাদের দিকে আসুন! আমরা আপনার হাতে বাইয়াত করব। তখন মাহদী বলবেন: তোমাদের দুর্ভোগ! তোমরা কত চুক্তি ভঙ্গ করেছ? কত রক্তপাত ঘটিয়েছ? আর কত আমানতের খেয়ানত করেছ? অবশেষে তিনি তাদের সম্মুখে অগ্রসর হবেন এবং অনিচ্ছা সত্যেও রুকন ও মাকামে ইব্রাহীমের মাঝে জনগণের বাইয়াত নিবেন। (কিতাবু উলূমিদ্দিন, ইমাম মুনজিরি রহ, হা: ৩২; আযিফাতিল আযিফাহ, খতীব বাগদাদী, হা: ২৭৯)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: অচিরেই ভারতের মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর অনেক জুলুম করবে। সেই সময় ভারতের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম বের হবে, যাদের নেতৃত্বে থাকবে 'মাহমুদ' নামের একজন দুর্বল যুবক, যার উপাধি হবে 'হাবিবুল্লাহ'। সে ভারতকে পরাজিত করার পর কাবার দিকে অগ্রসর হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কেন কাবার দিকে যাবে? কাবা কি তখন ইহুদি ও নাসারাদের দখলে থাকবে? তিনি বললেন: না, বরং সে আল্লাহর খলিফা মাহদীর হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য সেখানে যাবে। (কিতাবু উলূমিদ্দিন, ইমাম মুনযিরী, হা: ৪৭৮)

কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেনঃ অচিরেই মুমিন ও মুশরিকদের মাঝে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। সেই যুদ্ধে যারা শহীদ হবে তারা কতইনা উত্তম। আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল সেই যুদ্ধের আমির কে হবে? তিনি বললেনঃ উমরের বংশের একজন দুর্বল ব্যক্তি। যার নাম হবে মাহমুদ। (কিতাবু উলূমিদ্দিন, ইমাম মুনযিরী, হা: ৮৫৪)

عن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يغزو المسلمون على المشركين ويفتح الهند يأمر في غزوتها رجل ضعيف على الجسم ، اسمه محمود اسم إبيه عبد القدير، واسم أمّه سهراء ، هو من أهل البلد اسمه العسر من ملك مشرق الهند

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানগণ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হিন্দুস্থান বিজয় করবে তখন সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন একজন শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি। যার নাম মাহমুদ, যার পিতার আব্দুল কুদীর। আর তার মাতার নাম সাহরা। সে হিন্দের পূর্বাঞ্চলের দূর্গম নামক এলাকার একজন অধিবাসী হবে। (কিতাবু উলূমিদ্দিন, ইমাম মুনযিরী, হা: ৮৫৫; আযিফাতিল আযিফাহ, ২৬৬)

عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على حياة الناس زمان إذا كانوا لا يزالون يفسدون من السنة مرة أو مرتين فسادا، تبدأ إحداها بريح بخسران قلعة المشركين وانتهت بالمجاعة ويفتن المشركون فتنة قبل أن تنتهى المجاعة ، فتقدم جماعة المسلمين لمقابلتهم من بلاد مشرق الهند ولكن المشركين يقتلونهم كما تذكرون اسم الله على بهائم الأنعام في يوم معين ، فينهزمون ، كذلك تقدم جماعة الأخرى من المسلمين إليهم ، نصر الله معهم وإياهم الغالبون قال ثلاث مرات قال أميرهم ضعيف ، يكون ما أحسن للجماعة الأولى إن يتخذون أميرهم ، قلت يا رسول الله! لم يتخذون أميرهم؟ قال يزعمون أنفسم أنهم أهله

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু' একবার বিপর্যস্ত হবে। যার একটি শুরু হবে বায়ু (ঘূর্ণিঝড়) দ্বারা, মুশরিকদের দুর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে। আর

শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে, আর এই দূর্ভিক্ষ শেষ হতে না হতেই মুশরিকরা একটি ফেতনা সৃষ্টি করবে। যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব দেশ থেকে মুসলিমদের একটি জামাত ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে, যেমনি ভাবে তোমরা এক নির্ধারিত দিনে (কুরবানির দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করে থাক। ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ মুসলিমদের আরেকটি জামাআত তাদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করার জন্য)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। আর তারাই বিজয়ী! এ কথা তিনি (রসূল ﷺ) তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন তাদের নেতা হবে দুর্বল, আহ্! প্রথম দলটির জন্য কতই না উত্তম হত যদি তারা তাদের আমির কে গ্রহণ করতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কেন তারা তাদের আমির কে গ্রহণ করবে না? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই সময় তারা নিজেরাই নিজেদেরকে যোগ্য মনে করবে। (আযিফাতিল আযিফাহ, খতীব বাগদাদী, হা: ৮৩)

عن عليّ بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكثر المشركون من الهند ظلما على المسلمين فيخرج أمير من بلاد مشرق الهند اسمه محمود واسم أبيه عبد القدير يكون أن يراه ضعيفا جسما ، قليل القوّة بين الكشح على الورك ، يفتتح الله به المسلمين منها

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: অচিরেই হিন্দুস্থানের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দের পূর্বদেশ থেকে একজন আমীরের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যার নাম হবে মাহমুদ। এবং তার পিতার নাম হবে আব্দুল কুদীর। তাকে শারীরিকভাবে দুর্বল দেখাবে। যিনি উরুর উপর কোমরের মাঝে কম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন। তখন আল্লাহু তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে হিন্দের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন। (আযিফাতিল আযিফাহ, খতীব বাগদাদী, হা: ২৬৫)

عن حذيفة بن أسيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمضى على الناس زمان إذا اجتنب العلماء أنفسهم عن أن يقول الحق والذين يقولونه يقولون رجاء لعظمة ولكن لا يعملونه حقيقة، جهالهم رئيس الجمهورية ويتباهى المساجد لكن لا يعبد فيها، يكثر قتل الناس لكن لا يعلم المقتول لم يقتل، إذا وجدتم ذلك الزمان فارتقبوا شابا ضعيفا من نسب عمر لأنه أمير للمسلمين، إسمه محمود بن عبد القدير فإن وجدتموه فيجب على كل مسلم أن ينصروه

হযরত হুযায়ফা বিন উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি- মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হবে যখন আলেমরা নিজেদেরকে সত্য কথা বলা থেকে বিরত রাখবে। তখন যারা সত্য কথা বলবে তারা সম্মানের আশায় তা বলবে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা তদানুযায়ী আমল করবে না। তাদের সমাজ প্রধানরা হবে মূর্খ। মাসজিদ গুলোকে সুসজ্জিত করা হবে। কিন্তু সেখানে আবাদ করা হবে না। মানুষ হত্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু নিহত ব্যক্তি জানবে

না সে কেন নিহত হয়েছে। যখন তোমরা সেই সময়কাল পাবে তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বংশের একজন দুর্বল বালকের অপেক্ষা কর। কেননা তিনি মুসলিমদের আমীর। তার নাম মাহমুদ বিন আব্দুল কাদীর। যখন তোমরা তাকে পাবে তখন প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো তাকে সাহায্য করা। (আযিফাতিল আযিফাহ, খতীব বাগদাদী, হা: ৭৪)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تهلك حتى يرى الناس خمسة أملاك الذين يريدون أن يهدموا دين الله إجتماعا وهم يبقون في الأرض معا واحدا قلت يا رسول الله! ما معرفتهم؟ قال ، أحدهم يملك هذه أرض العرب ، إسمه كإسمي. ويجعل دين الله لهوا ويتخذ القوم الملعون أولياء ، وثانيهم يملك العالم ويشغل كيدا علي المسلمين وثالثهم ملك الهند يبدأ كيدا على المسلمين من ملك وليه ، ورابعهم الملك الثاني من الهند الذي يأتي إلى الحكومة بعد أن يعاهد بقتل المسلمين وهما من المشركين – وخامستهم امرأة ملكة التي تكتسب القدرة على الحكومة فتزيد عبادة البعل وتتخذ المشركين اولياء ، وتقتل المسلمين وهي تعرف نفسها من المسلمة ، فتجد هناك شابا ضعيفا من البلاد العسرة الذي يقع إنتهاء لكيدهم ويأت بفتح كبير للمؤمنين

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: নিঃসন্দেহে পৃথিবী ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসককে দেখবে যারা সম্মিলিত ভাবে আল্লাহর দ্বীনকে কলুষিত করতে চাইবে। আর তারা (পাঁচ শাসকই) এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই আরব ভূমির বাদশাহ হবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো, সে আল্লাহর দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদি) জাতিকে বন্ধু বানাবে। তাদের দ্বিতীয়জন হল সে বিশ্ব শাসন করবে। আর মুসলিমদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তাদের তৃতীয় হল হিন্দুস্তানের বাদশাহ, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলিমদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। তাদের চতুর্থ জন হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশাহ, যে মুসলিম হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসবে। এরা দুই জন মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের পঞ্চম জন হলো একজন নারী শাসক। সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের মূর্তিপুজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলিমদের হত্যা করবে। অথচ সে মুসলিম পরিচয়ে রাজ্য পরিচালনা করবে। তখন সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালককে দেখতে পাবে, যিনি তাদের ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটাবেন, এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবেন। (আযিফাতিল আযিফাহ, খতীব বাগদাদী, হা: ২৪)

অতঃপর, বলা আছে যারা রসূল ﷺ কর্তৃক মনোনীত আমীর বা খলীফা তারা মুহাদ্দাস হবেন তথা ইলহামপ্রাপ্ত হবেন। আর জানা যায় ২০১৭ সালে ইমাম মাহমুদ বিলায়েত প্রাপ্ত হন এবং তখন থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হন, যার

মাধ্যমে আল্লাহ তাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দান করেন। এর মাধ্যমে মুসলিমদের জামায়াত পরিচালনা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্যপ্রাপ্ত হন। আর এর ফলে সরাসরি আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে জামায়াত পরিচালিত হয় এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরাজ করে।

হাদিসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ الْوَحْيُ خَاصٌّ لِلْأَنْبِيَاءِ الَّذِي اسْتَكْمَلَ الدِّيْنَ إلا اللَّهُ الرَّحْمَنُ أَلْهَمَ بِالْمَلَائِكَةِ أَوْلِيَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَعْدَادُهُمْ اثْنَا عَشَرَ.

আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: তিনি বললেন, ওহী নাবীদের জন্য খাছ, যা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তবে দয়াময় আল্লাহ এই উম্মতের বারোজন ওলীকে (ইমাম) ফেরেশতাদের মাধ্যমে ইলহাম করেন। (কিতাবু উলূমিদ্দিন, ইমাম মুনজিরি রহ, হা: ১৬)

আবূ তাহির আহমদ ইবনু আমর ইবনু সারহ (রহঃ) ... আয়িশা (রা:) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাস, আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তবে সে উমার ইবনুল খাত্তাবই হবে।
ইবনু ওয়াহব বলেন 'মুহাদ্দাস' এর ব্যাখ্যা হল যার প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম হয়। (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ইসঃ ফাঃ ৫৯৮৭)

ওলিউল্লাহ দেহলভী (রহিঃ) "ইযালাতুল খফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেন। খিলাফাতে রাশেদার রয়েছে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। তিনি লিখেন-
(ক) খিলাফাতে রাশেদার অপরিহার্য শর্ত হলো খলিফা কে উম্মাহর প্রথম স্তরের হতে হবে। অর্থাৎ সিদ্দিক, শহিদ, নেককার এবং আল্লাহর পক্ষ হতে মুহাদ্দাস হতে হবে। মুহাদ্দাস হওয়ার অর্থ হলো, এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া যার অন্তরে অদৃশ্যলোক থেকে দিব্যজ্ঞান ইলহাম হয়ে থাকে। এবং ফেরেশতাগণ গোপনে যার সঙ্গে কথোপকথন করে থাকে। সিদ্দিকের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর পক্ষ হতে মুহাদ্দাস হওয়ার গুণ লাভ করেছিলেন উমর (রাঃ), যা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত। (আল আক্বিদাতুল হাসানা, লেখক: শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলবি (রহি:), অনুবাদক: আলি হাসান উসামা, পৃ: আলোচনার প্রথমাংশ ৮৬-৮৮)

অতএব, এ সকল হাদিস পড়লে এবং সাথে এই দল ও নেতাকে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আকিদা-মানহায, কর্মপদ্ধতি এগুলো যাচাই করলে যে কেউ স্পষ্টভাবে হক জামায়াত হিসেবে এই দলকে চিহ্নিত করতে পারবে ইনশা

আল্লাহ। তাই জামায়াত বাছাই পর্বে ইমাম মাহমুদ এর কাফেলাকে গ্রহণ করা এবং একে হক হিসেবে জানা ই সবচেয়ে যুক্তিসম্মত ও দলিলসম্মত।

আর আল্লাহ প্রদত্ত আমীর যখন আগমন করেন তখন অন্য কারো দল-মত টিকতে পারে না, অন্য কারো নেতৃত্ব চলতে পারে না। এ বিষয়ে আগেই বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

তাই আমরা দ্বীন কায়েমের জন্য ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর কাছে আনুগত্যের বায়াত নিবো এবং তাঁর নেতৃত্বে সাহসী সৈনিক হিসেবে রসূল ﷺ এর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতি তথা জিহাদ ও কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে ইসলামী ইমারাহ ও খিলাফাহ 'আলা মিনহাজিন নুবুয়াহ প্রতিষ্ঠা করার শপথ নিবো এবং আমীরের আদেশ-নিষেধ মান্য করে দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাবো ইনশা আল্লাহ।

একটি বিষয়

বর্তমানে দেখা যায় বিভিন্ন ইসলামী দলই আল্লাহর গজবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি তথা আমেরিকার খ্রিষ্টান ও ইজরায়েলের ইহুদীদের কথার সাথে তাল মিলিয়ে 'জিহাদ ও কিতাল' কে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, উগ্রবাদ, কট্টরপন্থী বলে ঘোষণা দেয়, সাথে আরো যুক্ত করে বলে- 'এখন আর সেই আগের যুদ্ধ নেই, রয়েছে ভোট / ভোটযুদ্ধ'। মূলত এটি হচ্ছে বিশ্বের সকল বিধর্মীদের মিলে তৈরি ইসলামকে ধ্বংস করার একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্ল্যান যার পরিকল্পনা করা হয়েছে শত বছর আগে। আর বর্তমানে মুসলিমরা সেই সকল বিধর্মীদের চোখে ভালো সাজতে যেয়ে জিহাদ ও কিতালকে উগ্রবাদী বলে নিজেরা ভালো শান্তিপ্রিয় মুসলিম বলে সমাজে নিজেদের মত ও দলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য থাকে-

বিধর্মী তথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের জান ও মাল হেফাজত করা এবং দুনিয়াতে আরাম আয়েশে কোন মতে দায় মুক্তি নিয়ে মারা যাওয়া। মূলত হক কথা বললে ও হক কাজ করলে তারা আক্রমণ করবেই।

তারা নিজেরা অনেক ভীতু এবং বিধর্মী ও বহিঃশত্রুর রোষানলে না থাকার জন্য, তাদের কাছে ভালো মুসলিম হয়ে জীবনধারণ করা। আর তারা যে মুসলিমের সংজ্ঞা দেয় সেই সংজ্ঞাকেই ইসলামী নীতি হিসেবে নেওয়া। সেভাবেই সিস্টেম এর মধ্যে থেকে ইসলামী রাষ্ট্র কিংবা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখা। আর তাই প্রকৃত ইসলামী তাওহীদবাদী জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাকে তুচ্ছ ভাবা ও অসম্ভব মনে করা। এর অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করে যে- তারা এখন শক্তিহীন, রাষ্ট্রও আমাদের সাহায্য করবে না শক্তি দিয়ে, সৈন্য দিয়ে, তারা খুবই শোচনীয় দুর্বল অবস্থায় তাই এই অবস্থায় মন্দের ভালোকে গ্রহণ করা ছাড়া তাদের কোন পথ নেই। কারণ জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, সৈন্য তৈরি করা, যুদ্ধসামগ্রী গুছানো এবং এর দাওয়াত দেওয়াই বড় এক হুমকি শত্রুদের (বিধর্মীদের) কাছে। আর এরকম করতে গেলেই বিধর্মীরা সেই অঞ্চলের তাদের অনুগত নামে মুসলিম তাগুত শাসকদেরকে চাপ প্রয়োগ ও হুমকি দিয়ে এই মতের চিন্তাকারীকেও বিনাশ করার হুকুম দিয়ে দেয়। আর তাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা নামে মুসলিম তাগুত শাসকের সাথে শত্রুতা না করে, নিজের জান-মালের বিনাশের হুমকিতে ভয় পেয়ে তাদের সাথে মিলে যতটুকু করা যায় সে চিন্তা করা। কিন্তু এভাবে কি হবে? হলে তো আরো অনেক বছর আগেই হতো। কিন্তু এভাবে কখনোই হবে না।

প্রকৃতপক্ষে যুগে যুগে দ্বীন কায়েম হওয়ার পদ্ধতি একই আর সেটি হচ্ছে জিহাদ ও কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ। কারণ আপনি যখন হক কথা বলবেন, হকের প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন তখন আপনাকে শত্রুরা বাঁধা দিবে, এমনকি হত্যা করতে চাইবে; যেমন চেয়েছিল রসূল ﷺ কে হত্যা করতে, ইসলামকে নিভিয়ে দিতে। অতঃপর যুদ্ধ করতে চাইবে এবং করবেও শুধু আপনার হকের আহবানকে বাঁধা দিতে। তখন আপনাকেও যুদ্ধে লিপ্ত হতেই হবে। আর নাহলে আপনার হকের কথা ও কাজকে তারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিঃশেষ করে দিবে। তাহলে আপনি কি হকের আহবানকে নিঃশেষ করে দিক সেটা চান? নিজের জান ও মালের কি হবে সেই নিয়ে ব্যস্ত? তাদের

আক্রমণ ও শক্তি দেখে থেমে যান? আবারো দ্বীন কায়েমে নতুন ভঙ্গুর কোন কৌশল নিয়ে চিন্তা করেন যাতে নিজের জান ও মাল বেঁচে যায়? এরকম হলে বলা যায় আপনি দুনিয়ার জন্যই কাজ করছেন, দ্বীন ইসলাম বা আখিরাতের জন্য কাজ করছেন না। আর যদি বলেন না আমি দুনিয়ার জন্য না দ্বীন ইসলাম ও আখিরাতের জন্য কাজ করছি, তাহলে তখন আপনারও শক্তি প্রয়োগ করে হককে টিকিয়ে রাখতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, পরিকল্পনা নিতে হবে, দাওয়াত দিয়ে আদর্শবান জনবল, জনমত তৈরির সাথে আল্লাহর সৈনিক তৈরি করতে হবে। শত্রুরা যখন যেভাবে আক্রমণ করতে আসবে, তখন তাদেরকে সেই জিনিস দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে, যদি শক্তি না থাকে তাহলে সঞ্চয় করতে হবে, প্রস্তুতি নিতে হবে আর প্রকাশ্যে না পারলে তা গোপনেই হোক না কেন। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন-

এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেননা। তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে যেখান হতে বহিস্কার করেছে তোমরাও তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার কর এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি (ফিতনা) গুরুতর এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; কাফিরদের জন্য এটাই প্রতিফল। তবে যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া (অন্য কারো বিরুদ্ধে) আক্রমণ করা চলবে না। (সূরহ বাকারাহ, আ: ১৯০-১৯৩)

আশা করি এই আয়াতগুলো পড়ে অন্তত এটি বুঝে আসার কথা যে- যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করতে আসে তাদের সাথে সেভাবেই মোকাবেলা করতে হবে। আর নাহলে এমন হবে যে আপনি হকের দাওয়াত দিয়ে

যাবেন আর শত্রুরা আপনাকে মেরে হককে নিঃশেষ করবে। এভাবে দাওয়াত দিয়ে কখনো পৃথিবীর অধিকাংশকে তো দূরে থাক ১০ ভাগের এক ভাগকেও সঠিক ইসলামে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, আর হকের পথের পথিক এর সংখ্যা যে কম থাকবে এটা তো আগেই বলে দেওয়া আছে। যদি উদাহরণ হিসেবে বলি আগের থেকে মুসলিমদের দাওয়াতি কাজ বেড়েই চলেছে, মাদ্রাসা মসজিদও নিত্য-নতুন হচ্ছে; মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে, তাওহীদবাদীও বাড়ছে কিন্তু খ্রিষ্টান দ্বারা মুসলিমদের হত্যার সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছে। মসজিদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গার ঘটনা কমেনি, বরং দিন দিন বাড়ছে। ইহুদী দ্বারা মুসলিমদের উপর হত্যা এখন গণহত্যায় রূপ নিয়েছে। তাই দাওয়াত যেমন কেয়ামত পর্যন্ত যতদিন মুসলিম থাকবে চলবে একই সাথে জিহাদ-কিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। তাই এসকল বিষয় বুঝে হক জামায়াতে যুক্ত থেকে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর আনুগত্য মেনে ইসলামী জীবন ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা গড়ায় একজন অংশীদার ও কর্মী হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারলে এটাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ। কারণ দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে চেষ্টা করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা।

তাই আল্লাহ আমাদের হক জামায়াতকে চিহ্নিত করে তাতে যোগদান করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

(লেখার তারিখ- ১০ই জানুয়ারী, ২০২৬ ঈসায়ী)